বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the ICT Movement in Bangladesh

এপ্রিল ২০২৫ বছর ৩৪ সংখ্যা ১২

APRIL 2025 YEAR 34 ISSUE 12

চ্যাটজিপিটির সীমাবদ্ধতা ও মানুষের সৃজনশীলতা

শিক্ষা ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহার

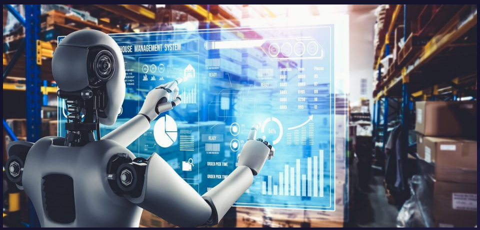

প্রযুক্তিতে তথ্য ভাণ্ডার ও রোবটের ব্যবহার

৩৪তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা

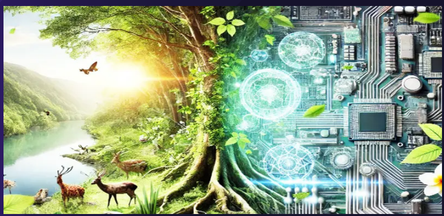

প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের কথা ভাবতে হবে

Lexar™

INDUSTRY-LEADING
MEMORY SOLUTIONS

FLASH DRIVE | SSD | RAM

Global Brand

কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসু জ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্‌তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
রিপোর্টার মোঃ মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার স্মৃপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Reporter Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

চ্যাটজিপিটির সীমাবদ্ধতা ও মানুষের সৃজনশীলতা

আজকের যুগে প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। তবে, একে ঘিরে কিছু উদ্বেগও তৈরি হয়েছে, বিশেষত সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে। চ্যাটজিপিটি, একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল, বর্তমানে সৃজনশীল কাজের প্রতি মানুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি করছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন যে, চ্যাটজিপিটি সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তবে, এই অভিযোগ কি সত্যি, নাকি প্রযুক্তির বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আরও সৃজনশীল হতে শিখছে? প্রথমত, চ্যাটজিপিটি বা যেকোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব মস্তিষ্কের পরিপূরক, কখনোই তার প্রতিস্থাপক নয়। এই প্রযুক্তি যেমন মানুষের জন্য সময় এবং পরিশ্রম বাঁচানোর সুযোগ সৃষ্টি করে, তেমনই এটি সৃজনশীলতার জন্য নতুন দিগন্তও উন্মোচন করে। একজন লেখক বা শিল্পী যখন কোনো নতুন সৃষ্টি নিয়ে কাজ করেন, তখন চ্যাটজিপিটি তাকে দ্রুত ধারণা বা তথ্য প্রদান করতে সক্ষম। এটি তাদের চিন্তার গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং আরও গভীর, জটিল সৃজনশীল কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে, চ্যাটজিপিটি বা কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল যে সৃজনশীলতা ধ্বংস করছে, এমন ধারণা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক। সৃজনশীলতা মানুষের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য এটি বুদ্ধি, অনুভূতি, এবং অভিজ্ঞতার মিশ্রণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো একক-ভাবে এটি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। চ্যাটজিপিটি যদি লেখা, চিত্র বা গান তৈরি করতে পারে, তা শুধুমাত্র মানুষের নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে। প্রযুক্তির এই সহায়তা সৃজনশীলতাকে মজবুত করতে পারে, না যে তার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বিনষ্ট করবে। সৃজনশীলতার মূল ধারণা হচ্ছে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, এবং এটি কেবল প্রযুক্তির দ্বারা নয়, বরং মানুষের কল্পনা, অনুভূতি, এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ দ্বারা সম্ভব হয়। চ্যাটজিপিটি বা অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল কোনো দিনও এই মানবিক উপাদানগুলোর প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। বরং, এটি মানুষের সৃজনশীলতাকে আরও প্রসারিত করতে সহায়ক হতে পারে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রযুক্তির অতি ব্যবহার, বিশেষ করে একে অনুকরণমূলক কাজের জন্য ব্যবহৃত হলে, মানুষের নিজস্ব সৃজনশীলতা হ্রাস পেতে পারে। কাজেই, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা চ্যাটজিপিটি এবং অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশলগতভাবে করি, যেন এটি আমাদের সৃজন-শীল শক্তিকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে, ধ্বংস না করে। শেষে, চ্যাটজিপিটি সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করছে এমন একটি ধারণা শুধুমাত্র একপেশে চিন্তা হতে পারে। সৃজনশীলতা মানবতার অমূল্য সম্পদ, এবং প্রযুক্তি কখনোই তা পরিবর্তন করতে পারে না। বরং, এটি আমাদের নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে, যদি আমরা সঠিকভাবে এর ব্যবহার শিখি।

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রযুক্তি নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুততর করছে। তবে প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি মাঝে মাঝে আমাদের মেধা ও সৃজনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তি, বিশেষ করে চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে বিভিন্ন কঠিন কাজ সহজে করার জন্য এআই টুল আবিষ্কার হয়েছে। প্রতিনিয়ত এআই টুল তৈরী হচ্ছে। এটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে শুরু করে প্রবন্ধ লেখা, কোডিং, এবং সৃজনশীল কাজেও পারদর্শী। ফলে, মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই নিজে চিন্তা-ভাবনা না করেই এআই-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এভাবেই মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আমাদের সমাজে। মেধা ও সৃজনশীলতা ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে এই চ্যাটজিপিটি।

আমাদের মস্তিষ্কের মাধ্যমে সৃজনশীলতার চর্চা হয়। সৃজনশীল কাজ, সৃজনশীল লেখা সৃষ্টি হয়। যেকোনো কাজে তখন সৃজনশীলতার ছাপ থাকতো। বলা যায় সৃজনশীলতার চর্চা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সেই চর্চা আর হয় না। সেটি এআই টুল ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে। মানব সমাজের মস্তিষ্ক হয়ে পড়ছে নিষ্ক্রিয়। একজন লেখক, শিল্পী বা গবেষক যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে তাদের কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

cudy
WHOLE HOME MESH
300Mbps Multi-Mode
5 in 1 Mesh Router
Router | Access Point | Extender | WISP | Mesh Satellite Multi-mode
5-In-1 Multi-Mode
WIREGUARD
2x2MIMO
MODEL
WR300
cudy
Call For Details:
+880 1977 476 546
Global Brand

কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
এপ্রিল ২০২৫ বছর ৩৪ সংখ্যা ১২

সূচিপত্র

Advertisers' INDEX

02 Global Brand

04 Global Brand

46 UCC

৩. সূচিপত্র

৫. সম্পাদকীয়

৬. প্রযুক্তিতে তথ্য ভাণ্ডার ও রোবটের ব্যবহার

ইন্টারনেট হলো একটি বিশাল বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একসঙ্গে বিভিন্ন কম্পিউটার, সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহ সংযুক্ত থাকে। ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তথ্য আদান-প্রদান করে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ স্থাপনের আশপাশে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করতে পারে। আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও স্ট্রিমিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও মেইল আদান প্রদান যাই করি না কেন, তার মূল শক্তি হলো ডাটা সেন্টার। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডাটা সেন্টার হলো তথ্যকেন্দ্র। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক ডাটা জমা হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তাকে সাধারণ অর্থে ডাটা সেন্টার বলে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনায় ডাটা সেন্টার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ডাটা সেন্টার হলো একটি নির্দিষ্ট স্থান (বিল্ডিং অথবা জায়গা), যেখানে সার্ভার ও ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়। একটি ডাটা সেন্টারে অনেক সার্ভার থাকে, যারা নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। আমরা যখন ব্রাউজাওে কোনো ইউআরএল (ইউনিফর্ম রিসোর্স লুকেটর) এ প্রবেশ করি তখন তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা সেন্টারে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রসেস হয়ে আবার আমাদের কাছে চলে আসে। মূলত একের অধিক সার্ভার নিয়ে গঠিত হয় ডাটা সেন্টার। এই বিশাল পরিমাণ সার্ভার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল রাখার জন্য অনেক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে স্থান বিবেচনা করা এবং অবকাঠামোর বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভার স্থাপনের জন্য সাধারণত এমন স্থান অথবা অবকাঠামো নির্বাচিত করা হয়, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা প্রায় ০% থেকে ৫%। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডাটা সেন্টারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতি সাধন করে থাকে। এছাড়া অনেক বড় জায়গা নিয়ে এর ভিত্তি থাকতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে চাহিদা মতো ডাটা সেন্টারের ক্যাপাসিটি বাড়ানো যায়। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৩. শিক্ষা ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্টের ব্যবহার

প্রযুক্তির দুনিয়ায় বর্তমানে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। শুধু চর্চা নয়, বেড়েছে ব্যবহারও। মানবসভ্যতার উন্নয়নে এ প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে চলছে গবেষণা। আর সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারই প্রবেশ ঘটেছে শিক্ষা ক্ষেত্রেও। সেটা ভালো হবে কী মন্দ হবে, তা নিয়ে চলছে অনেক বিতর্ক। তবুও এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর একটি বিশ্ব আমাদের তৈরি হবে। আর সেই বিশ্বে পদচারণা করবে আজকের দিনের নতুন প্রজন্ম; আপনার আমার সন্তানরা। সেই বিশ্বে আমাদের সন্তানরা কেমন করবে, তা অনেকখানিই নির্ভর করবে তাদের 'ডিজিটাল প্রযুক্তি জ্ঞানের উপর'। তাই বর্তমান বিশ্বের অভিভাবকরা চাচ্ছেন তাদের সন্তানরা যেন শৈশব থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর বেসিক কিছু জ্ঞান অর্জন করে। আজকের দিনে মানুষ বেশিরভাগ সময় মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে, কম্পিউটার ও মোবাইলের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কীভাবে এ অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইটগুলো তৈরি হয় তা অনেকেরই অজানা। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৬. প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের কথা ভাবতে হবে

ইলেকট্রনিক (ই-বর্জ্য) বর্জ্য বলতে বোঝায় পরিত্যক্ত বা উপযোগিতাহীন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। এ বর্জ্যগুলো মূলত মানুষের বাসাবাড়িতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন: টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, ওভেন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, চার্জার, বাল্ব, ব্যাটারি ইত্যাদি।
বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার জন্য মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।
ই-বর্জ্যের মধ্যে সাধারণত থাকে লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রৌপ্য, তামা, সিসা, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি। এসব লৌহজাত, অলৌহজাত ও বিষাক্ত পদার্থের বাণিজ্যিক মূল্যের পাশাপাশি রয়েছে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন উপাদান। তিনটি উৎস থেকে বাংলাদেশে ই-বর্জ্য মূলত উৎপন্ন হয়। যেমন এক. প্রাথমিক ব্যবহার ও মেয়াদোত্তীর্ণ-পরবর্তী পণ্য। দুই. প্রবাসী শ্রমিকদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আনা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং তিন. উন্নত দেশগুলো থেকে অবৈধভাবে আনা পুরনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।
ই-বর্জ্যে সিসা, পারদ, ব্রোমিনেটেড ফ্লেম রিটাডেন্টের মতো বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির কারণে এটি পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে প্রতিনিয়ত। এর অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, যত্রতত্র পোড়ানো ও ভূমি ভরাটের মাধ্যমে মাটি, পানি ও বায়ুকে দূষিত করে। পরবর্তী সময়ে এ দূষণ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে মানবস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বেই ক্রমাগত এর পরিমাণ ও ধরন বাড়ছে।
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

২০. চ্যাটজিপিটির সীমাবদ্ধতা ও মানুষের সৃজনশীলতা

আজকের যুগে প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

২১. কমপিউটার জগৎ খবর

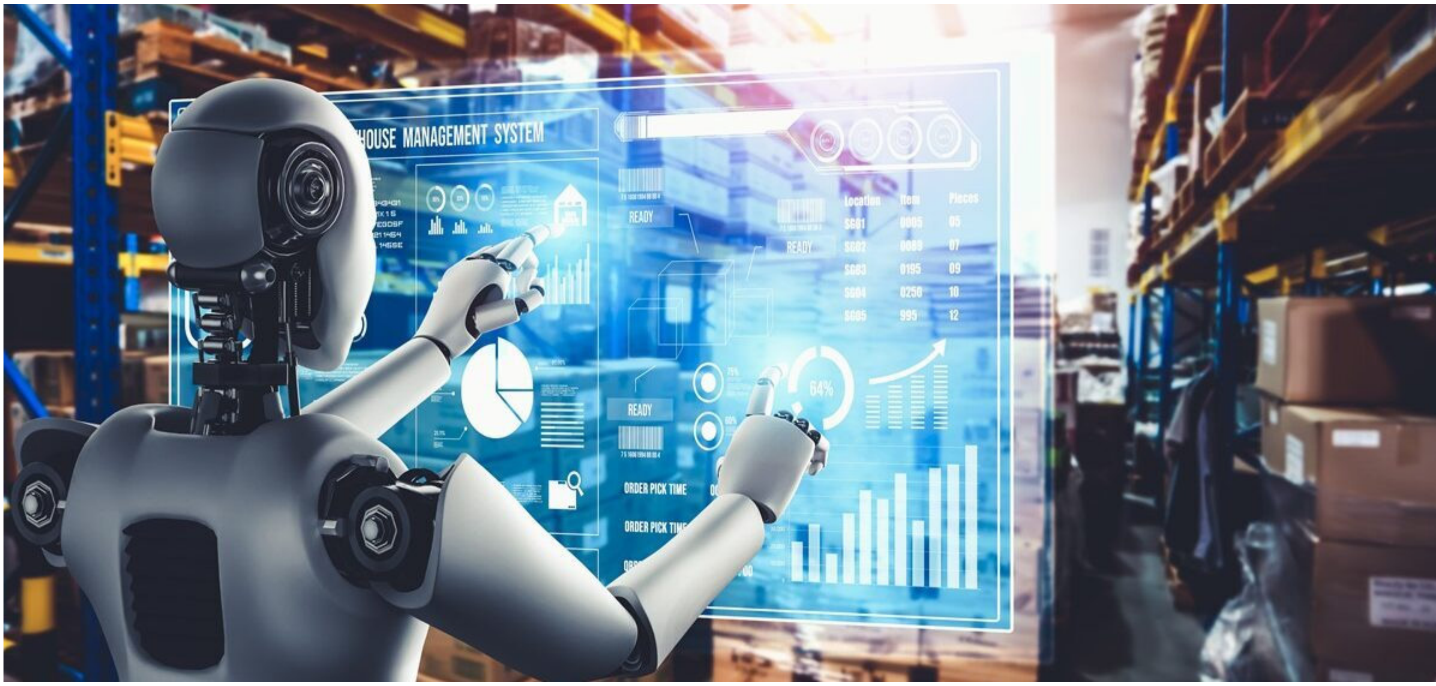

প্রযুক্তিতে তথ্য ভাণ্ডার ও রোবটের ব্যবহার

হীরেন পণ্ডিত

ইন্টারনেট হলো একটি বিশাল বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে একসঙ্গে বিভিন্ন কম্পিউটার, সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহ সংযুক্ত থাকে। ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তথ্য আদান-প্রদান করে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ স্থাপনের আশপাশে পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করতে পারে। আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও স্ট্রিমিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও মেইল আদান প্রদান যাই করি না কেন, তার মূল শক্তি হলো ডাটা সেন্টার। সহজ ভাষায় বলতে গেলে ডাটা সেন্টার হলো তথ্যকেন্দ্র। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক ডাটা জমা হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তাকে সাধারণ অর্থে ডাটা সেন্টার বলে। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবস্থাপনায় ডাটা সেন্টার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ডাটা সেন্টার হলো একটি নির্দিষ্ট স্থান (বিল্ডিং অথবা জায়গা), যেখানে সার্ভার ও ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়। একটি ডাটা সেন্টারে অনেক সার্ভার থাকে, যারা নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। আমরা যখন ব্রাউজাওে কোনো ইউআরএল (ইউনিফর্ম রিসোর্স লুকেটর) এ প্রবেশ করি তখন তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা সেন্টারে প্রবেশ করে এবং সেখানে প্রসেস হয়ে আবার আমাদের কাছে চলে আসে। মূলত একের অধিক সার্ভার নিয়ে গঠিত হয় ডাটা সেন্টার। এই বিশাল পরিমাণ সার্ভার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা (২৪/৭) নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল রাখার জন্য অনেক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে স্থান বিবেচনা করা এবং অবকাঠামোর বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সার্ভার স্থাপনের জন্য সাধারণত এমন স্থান অথবা অবকাঠামো নির্বাচিত করা হয়, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা প্রায় ০% থেকে ৫%। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডাটা সেন্টারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতি সাধন করে থাকে। এছাড়া অনেক বড় জায়গা নিয়ে এর ভিত্তি থাকতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে চাহিদা মতো ডাটা সেন্টারের ক্যাপাসিটি বাড়ানো যায়।

ক্লাউড কম্পিউটিং আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম আজ ইন্টারনেট ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পড়াশোনা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদিতে ইন্টারনেটের আশ্চর্যজনক ছোঁয়া রয়েছে। দৈনন্দিন এসব কাজের পেছনে রয়েছে ইন্টারনেট ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রতিদিন শুধু ইউটিউবেই প্রায় চার মিলিয়ন বা ৪০ লাখ ঘণ্টার ভিডিও আপলোড করা হয়। বিশ্বের প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন (চারশ' কোটি) মানুষ প্রতিদিন কোনো না কোনো ভাবে বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছেন। এর ফলে, আড়াই মিলিয়ন টেরাবাইট নতুন তথ্য তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন। পুরনো তথ্যের সঙ্গে এই নতুন তথ্য রাখার জন্য প্রয়োজন বিশাল তথ্য ভাণ্ডার বা ডেটা সেন্টার। বিশালাকার জায়গা জুড়ে শত শত সার্ভার নিয়ে তৈরি করা হয় একটি ডেটা সেন্টার। এদিকে ফেসবুক বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০০ কোটি লোকের ডাটা সংরক্ষণ করে রাখে ফেসবুক। এছাড়াও প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিদিন ফেসবুক ব্যবহারকারীরা টাইমলাইনে লেখা, ছবি, ভিডিও পোস্ট করেন, যা ডাটা হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। এমনকি ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যও সংরক্ষণে রাখে ফেসবুক। ব্যবহারকারীদের ডাটা সংরক্ষণ করতে অন্যান্য টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানের মতো বিভিন্ন দেশে অনেক ডাটা সেন্টার তৈরি করেছে ফেসবুক। ডাটা সেন্টার অনেক বড় একটি প্রোজেক্ট। ডাটা সেন্টারে সাধারণ থেকে অনেক হাই প্রোফাইল ডাটা স্টোর থাকে। যে ডাটাগুলো ডিলিট বা নষ্ট হয়ে গেলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ডাটাগুলো নিরাপদ রাখার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন দুই ধরনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রাখা হয়ে থাকে। প্রতিটি ডাটা সেন্টারের প্রাণ হলো ডাটা। বর্তমান সময়ে সব থেকে রিলায়েবল ব্যাকআপ সিস্টেম হচ্ছে ক্লাউড। ডাটা সেন্টারে

ডাটা সংরক্ষণ ও বিপণন করার জন্য পরিচালনা ব্যয় হিসেবে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ইন্টারনেট পরিচালনা করতে গেলে এ সকল ডাটা সেন্টারের বিকল্প নেই। কারণ, ডাটা সেন্টার ছাড়া আমাদের ডাটা রাখা ও অ্যাক্সেস করার মতো সিকিউর পদ্ধতি নেই। অন্যদিকে, ডাটা সেন্টারগুলোয় ডাটা অনেক নিরাপদ ও ত্রুটিমুক্ত থাকে। শুধু তাই নয়, সেখানে ডাটার পর্যাপ্ত ব্যাকআপ থাকায় কোনো দুর্ঘটনায় ডাটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে কম। একটি ডাটা সেন্টারের কাজ হলো, সার্ভারগুলোকে ৩৬৫ দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল থাকার জন্য পাওয়ার, নেটওয়ার্ক, সিকিউরিটি, কুলিং সিস্টেম এবং অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা। ডাটা সেন্টারের প্রধান কাজ হলো, ডাটা স্টোর করা এবং ইন্টারনেট সচল রাখা।

ডাটা সেন্টার মূলত একটি শীতল স্থান, যেখানে সার্ভারগুলোকে র‍্যাকের মধ্যে সারি সারি করে সাজিয়ে রাখা হয়। যাতে সার্ভারগুলো তাদের কার্যপ্রক্রিয়া একটি স্বাভাবিক তাপমাত্রার মধ্যে পরিচালনা করতে পারে। যেখানে সকল ধরনের ডাটা স্টোরেজ থেকে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট, ব্যাকআপসহ যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হয়। ডাটা সেন্টারে সাধারণত স্টোরেজ ডিভাইস, নেটওয়ার্কিং ডিভাইসসহ অন্য অনেক হার্ডওয়্যার ডিভাইস থাকে। প্রথমত, সার্ভারগুলো রেডি করার জন্য মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, স্টোরেজ ইত্যাদি সেটআপ করে নেওয়া হয়। পরে সেগুলো পর্যায়ক্রমে স্টোরেজ র‍্যাকগুলোতে সাজানো হয়। তারপর রাউটার, সুইচ, ফায়ারওয়ালসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং যন্ত্রাংশ দিয়ে সার্ভারগুলোকে ইন্টারলিঙ্কিং করে তা ইন্টারনেটের সঙ্গে জুড়ে

দেওয়া হয়। তখন গ্রাহকরা উক্ত সার্ভার স্পেস ব্যবহার করে সার্ভিস নিতে পারেন। প্রতিটি সার্ভারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ভিত্তিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কোনো ধরনের ঝামেলা বাদে সব সময় ইন্টারনেটের সঙ্গে কানেক্টেড রাখা হয়। প্রতিনিয়ত তাপমাত্রা (টেম্পারেচার) মেইন্টেইন করা হয়। এ সকল কিছু সঠিকভাবে পরিচালনা করার পর তা প্রান্তিক পর্যায়ে কাস্টমারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ইন্টারনেট হলো ডাটা সেন্টারের হার্ট। ডাটা সেন্টারগুলোতে যে সার্ভার বসানো থাকে, সেগুলো থেকে ডাটা আদান-প্রদানসহ যাবতীয় কাজ করার জন্য প্রয়োজন হলো ইন্টারনেট। আর এই ইন্টারনেট কানেক্ট করার জন্য ঝামেলাহীন একটি নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাতের কাছেই তথ্য সার্ভার এবং সিডিএন প্রযুক্তি

স্লো ইন্টারনেট স্পিড যেমন একটি বিরক্তির কারণ, তেমনি স্লো ওয়েবসাইট স্পিড একটি অভিশাপ। কারণ, ওয়েবসাইট স্লো হলে তা ইউজারের কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বিকল্প ওয়েবসাইটে মুভ করে, যার ফলে ওয়েবসাইট তৈরির আসল উদ্দেশ্য সফল হয় না। এতে ওয়েবসাইট থেকে আসা ইনকাম কমে যায় এবং ওয়েবসাইট সার্চ ইঞ্জিনে র‍্যাঙ্ক ড্রপ করে। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই হোস্টিং পরিবর্তন করে বা ওয়েবসাইট স্পিড অপ্টিমাইজ করে। তবে হোস্টিং পরিবর্তন না করে সহজেই যে কোনো ওয়েবসাইটের লোডিং স্পিড কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা যায় সিডিএন প্রযুক্তিতে। কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো সিডিএন। এটি বিশ্বজুড়ে অবস্থিত সার্ভারগুলোর একটি নেটওয়ার্ক (পিওপি নামেও পরিচিত), যা ইউজারকে কনটেন্ট ডেলিভারি করে থাকে। অনেকটা ওয়েব সার্ভারের মতো কিন্তু এতে সাধারণ সার্ভারের মতো ফাইল স্টোর করা যায় না। সাধারণ সার্ভারগুলোয় ওয়েবসাইটের ফিজিক্যাল ফাইল স্টোর করে, যা ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পায়। কিন্তু সিডিএন ওয়েবসাইটে সেই একই ফাইল দেখায়, তবে তাদের নিজস্ব জিওলজিক্যাল সার্ভার থেকে। ব্যবহারকারী যখন ব্রাউজারে কোনো পেজ দেখার রিকোয়েস্ট করে, তখন সে রিকোয়েস্ট তার লোকেশনের কাছাকাছি কোনো সিডিএন সার্ভার থেকে খুঁজে বের করে দেখায়। এর ফলে, ইন্টারনেট স্পিড স্লো হলেও দ্রুত পেজ লোড হয়। ধরুন আপনার একটি ওয়েবসাইট আছে যা ইংল্যান্ডের একটি সার্ভারে হোস্ট করা আছে। কিন্তু আপনার সকল ভিজিটর থাকে বাংলাদেশে। তাহলে কেউ যদি আপনার ওয়েবসাইট দেখতে চায়, তাহলে ব্রাউজার পেজ রিকোয়েস্ট সেন্ড করার পর তা অনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ডে যাবে এবং উক্ত পেজ নিয়ে সেই একই দূরত্ব অতিক্রম করে ব্রাউজাওে দেখাবে। এক্ষেত্রে যদি সেই একই ওয়েবসাইট ইউজারের নিকটবর্তী (বাংলাদেশে) কোনো সার্ভার থেকে ব্রাউজারে শো করানো যায়, তাহলে কিন্তু অনেক দ্রুত পেজ লোড হবে। এটাই হচ্ছে সিডিএন প্রযুক্তির কাজ।

সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সিডিএন কাজ করে। ১. দূরত্ব কমানো: কনটেন্টকে ভিজিটরের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য এখানে পয়েন্ট অব প্রেজেন্টস পদ্ধতি ইউজ করা হয়। অর্থাৎ একসঙ্গে অনেক ক্যাশিং সার্ভার নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনেকটা ডাটা সেন্টারের মতো তৈরি করে তথ্য আদান-প্রদানের পুরো রাস্তা কমিয়ে আনা হয়। ২. লোকাল সার্ভার তৈরিকরণ: প্রতিটি ক্যাশিং সার্ভার সিডিএন ইউজ করে প্রতিটি ওয়েবসাইট ক্যাশ করে রাখে। বিভিন্ন দেশে সার্ভার থাকার কারণে যে কোনো লোকেশন থেকে ওয়েবসাইট ভিজিট করলে, সেই লোকেশনের কাছাকাছি সার্ভার থেকে পেজ লোড হয়। এতে যেমন ওয়েবসাইট লোডিং স্পিড কমে, তেমনি ব্যান্ডউইথ অনেক কম খরচ হয়। ৩. গতি বাড়ানো: ক্যাশিং সার্ভারগুলো সাধারণত এসএসডি, এইচডিডি অথবা র‍্যাম দিয়ে তৈরি। তবে বেশিরভাগ সার্ভার র‍্যাম দ্বারা তৈরি। কারণ, র‍্যাম এসএসডির থেকে দ্রুত ফাইল রিড এবং রাইট করতে পারে। সিডিএন ইউজ করার জন্য ব্যবহারকারীকে কোনো সিডিএন প্রোভাইডার থেকে সার্ভিস নিতে হয়, যেমন ক্লাউডফ্লেয়ার। ফ্রি অথবা পেইড দুই ভাবেই সিডিএন সার্ভিস ব্যবহার করা যায় এবং সকল প্রকার ওয়েবসাইট যেমন ব্লগার, ওয়েবলি, ওয়ার্ডপ্রেসসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়। ওয়েবসাইটে সিডিএন অ্যাক্টিভ করার জন্য ডোমেইন এবং মূল ওয়েবসাইট ডাটাবেস থেকে কনফিগার করে নিতে হয়, যাতে কেউ ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে চাইলে সিডিএনের নেমসার্ভার ডিটেক্ট করে তথ্য ক্যাশ সার্ভারে নিয়ে আসে। বর্তমানে মার্কেটে যে কয়টি জনপ্রিয় সিডিএন রয়েছে তার মধ্যে ক্লাউডফ্লেয়ার অন্যতম। ২০০৯ সালে ম্যাথু প্রিন্স, লি-হোলোওয়ে এবং মিচেল জাটলিন তিনজন মিলে প্রজক্ট হানি পট নামে একটি ওপেন সোর্স প্রজেক্টে

কাজ করছিল, তখন তারা ক্লাউডফ্লেয়ার তৈরি করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ক্লাউডফ্লেয়ার লঞ্চ করা হয় এবং ২০১১ সালে মিডিয়ার এটেনশন পেয়ে মোটামুটি জনপ্রিয়তা পায়।

ক্যাশ সার্ভারের কাজও সিডিএন এর মতই, মূলত মূল সার্ভার ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে দূরত্ব কমানো। সেই সঙ্গে সার্ভার ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের চাপ নিয়ন্ত্রণ করা। প্রযুক্তিবিদদের মতে, ক্যাশ সার্ভার হলো গুগল, ফেসবুক কিংবা ইউটিউবের মতো সাইটগুলোকে প্রধান সার্ভারের সঙ্গে সংযুক্ত সহযোগী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা বা স্থানীয় ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করাকে বুঝায়। যেমন বাংলাদেশ থেকে গ্রাহকরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে গুগল, ইউটিউব কিংবা ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো। কিন্তু এগুলোর মূল সার্ভার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ফলে বাংলাদেশে বসে গুগল, ইউটিউব, ফেসবুক ব্যবহার করার সময় যদি সরাসরি আমেরিকার সেই সার্ভার থেকে ডেটা পেতে হয়, তাহলে সেটার গতি অনেক কম হয়। এই সমস্যা সমাধানে ইউটিউব, ফেসবুকসহ অধিকাংশ প্ল্যাটফর্মই ক্যাশিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এর সুবিধা হল, যখন কোনো ইউজার ইউটিউব কিংবা ফেসবুকের মতো সেবা ব্যবহার করেন, তখন সেটি আর আমেরিকার সার্ভার খুঁজবে না বরং কাছাকাছি যে স্থানীয় সার্ভার আছে সেটা থেকেই ডেটা নিয়ে আপনাকে প্রদর্শন করবে। কারণ ওই কন্টেন্ট স্থানীয় ইন্টারনেট সেবাদাতার ক্যাশ সার্ভারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা আছে। পরবর্তীতে একই কনটেন্ট যদি ওই দেশটির কোনো গ্রাহক সার্চ করে, তখন স্থানীয় সার্ভার থেকে অল্প ডেটা খরচ করে ওই তথ্য খুব দ্রুত পাওয়া যায়। ফলে নতুন করে আমেরিকা বা ইউরোপ থেকে পুনরায় পুরো নেটওয়ার্ক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না। এক কথায় ক্যাশ সার্ভার যতো কাছাকাছি থাকবে গ্রাহকরা ততো দ্রুত সার্ভিস পাবে। এই পদ্ধতিতে ইউজার ট্রাকিং করাও সহজ হয় যা নিরাপত্তার জন্য খুবই কার্যকর।

ক্যাশ সার্ভারের আরো অনেক সুবিধা আছে যেমন : ব্যান্ডউইথ খরচ কমায় এবং অল্প টাকায় গোটা বিশ্বের লোকাল ক্যাশ সার্ভার ইউজ করা যায়, ওয়েবসাইটের সিকিউরিটি উন্নত করে, ওয়েবসাইটের বিস্তারিত অ্যানালিটিক্স রিয়েল ডাটা পাওয়া যায়, ফাইল মিনিফাই করার ফলে সার্ভারে স্টোরেজ সেভ হয়। সুবিধার পাশাপাশি অনেক অসুবিধা আছে যেমন : শেয়ার নেটওয়ার্ক কানেকশন ইউজ করে, ভিপিএন কানেকশনে অনেক সময় সাইট ব্লক থাকে, বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরিপূর্ণভাবে ক্যাশ সার্ভার ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়নি ইত্যাদি। বাংলাদেশেও ক্যাশ সার্ভার সংখ্যার সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৈধ ক্যাশ সার্ভারের সংখ্যা এক হাজার ২২টি। এর মধ্যে আইএসপির কাছে ৮৩টি, ফেসবুকের ৪৩টি এবং গুগলের ৪০টি সার্ভার আছে। আইএসপি জোনালে রয়েছে ৭০টি, যেখানে ফেসবুকের ৩২টি এবং গুগলের ৩৮টি। আইএসপি ক্যাটাগরি এতে রয়েছে ৬৫টি (গুগলের ২২, ফেসবুকের ৪৩), ক্যাটাগরি সিতে রয়েছে ১৭টি ফেসবুক ১১, গুগল ৬)। আইআইজিতে ফেসবুকের রয়েছে ২৮৩টি, গুগলের ১৪৯টি, আকামাইর ২৪টি, ক্লাউডফেয়ারের ২৯টি, বিগো লাইভের ২৫টি, জি-কোর ল্যাবস এর ১টি, আইএমও এর ১টি, মাইক্রোসফটের ১টি, জেনলেয়ার এর ১৯টি। আইএসপি ন্যাশনওয়াইডদের কাছে রয়েছে ফেসবুকের ৩৭৮টি, গুগলের ২১৯টি। মোবাইল অপারেটরদের কাছে ফেসবুকের ১৬২টি, গুগলের ৮০টি, আকামাইর ১২টি, ক্লাউডফেয়ারের ২টি। তবে বৈধসংখ্যার পাশাপাশি গুগল ও ফেসবুকের কাছে অসংখ্য অবৈধ ক্যাশ সার্ভার রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্যাশ সার্ভার থাকায় জাতীয় তথ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। বিশেষ করে গুগল বা ফেসবুকের মতো প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই কোনো কনটেন্ট নিয়ে সরকারের আপত্তি থাকলেও তা চাইলেই বাংলাদেশ বন্ধ করতে পারে না। প্রায়ই এসব সার্ভার থেকে ধ্বংসাত্মক গেম ছড়িয়ে দেওয়া হয় যা দেশের সংস্কৃতিতে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিটিআরসি এবং ইন্টারনেট সেবা সংগঠনগুলোর মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গত বছরও জুলাই মাসে গুগলের ক্যাশ সার্ভার চালুর নির্দেশ দিয়েছিল বিটিআরসি, কিন্তু বাস্তবায়ন হয়নি। অবশেষে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ এ স্থানীয় পর্যায়ে আইএসপিদের কাছ থেকে ক্যাশ সার্ভার উঠিয়ে নেওয়ার আদেশ বাতিল করেছে বিটিআরসি। ফলে প্রয়োজনীয় নীতিমালাসহ সবার জন্য উন্মুক্ত হলো ক্যাশ সার্ভার।

রোবট সব কিছুই করতে পারে

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে রোবট আবিষ্কৃত হয়ে এর ব্যবহার শুরু। তাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করার এই যন্ত্র মানুষের কাছে বহুল পরিচিত। তবে কোবট শব্দটি এখনো খুব পরিচিত নয়। কোলাবোরেটিভ রোবটের সংক্ষিপ্ত শব্দরূপ কোবট। বাংলায় বলা চলে 'সহযোগিতাপূর্ণ রোবট'। এটি একটি উন্নত রোবট প্রযুক্তি, যা মানুষের সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম। সাধারণত এমনভাবে কোবটের নকশা করা হয়, যাতে মানুষ ও রোবট পাশাপাশি একসঙ্গে নিরাপদভাবে কাজ করতে পারে, যেখানে রোবট মানবশ্রমের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তবে কোনোভাবেই তার কাজের পরিসর বা স্বাধীনতা থেকে মানুষের কাজ বিপন্ন হয় না। কোবটের ধারণাটি আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে এবং এটি মানব-রোবট সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বিজ্ঞানী ডেভিড হাজিনস ও তাঁর সহযোগীরা ১৯৯০-এর দশকে কোবট বা সহযোগিতাপূর্ণ রোবটের ধারণা প্রথম তুলে ধরেছিলেন। তবে কোবটের প্রথম নকশাটি তৈরি হয় ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অরিগনে। এখানে গবেষকেরা মানুষের সঙ্গে রোবটের নিরাপদ যোগাযোগের উপায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। আর এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় ২০০৮ সালে, যখন ইউনিভার্সাল রোবট নামে ডেনমার্কের একটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বাজারে প্রথম কোবট নিয়ে আসে। কোবটের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সাহায্য করা। তাই এর নকশা এমনভাবে করা হয়, যাতে এটি সহজেই মানুষকে সহায়তা করতে পারে এবং তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারে। বেশির ভাগ কোবটেই রয়েছে উন্নত সেন্সর, ক্যামেরা ও নিরাপত্তাব্যবস্থা, যেগুলো

রোবট ও মানুষের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে। কোবটে সাধারণ রোবটের তুলনায় অনেক বেশি মসৃণ ভাব ও নিরাপত্তা থাকে, যাতে মানুষের শারীরিক কোনো ক্ষতি না হয়।

বাজারে বেশ কিছু কোবটের অস্তিত্ব থাকলেও আল্ট্রালাইটওয়েট কোবট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোবট এবং মোবাইল কোবটের ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বেশি। নামেই প্রকাশ পায় যে আল্ট্রালাইটওয়েট কোবট খুবই হালকা ও ছোট আকারের, যেগুলো ছোট ছোট কাজের জন্য উপযোগী। এগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য তৈরি করা হয়, যেমন কোনো যন্ত্রে ছোট ছোট যন্ত্রাংশ সংযোজন বা প্যাকেজিং করা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোবট বড় আকার এবং জটিল শিল্পকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন পণ্য উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত যন্ত্রাংশগুলো জোড়া লাগানো বা সরিয়ে ফেলার কাজ। আর মোবাইল কোবটের স্থানান্তরিত হওয়ার সক্ষমতা রয়েছে এবং সে বিভিন্ন ধরনের পরিবহন ও সংগ্রহের কাজ সম্পাদন করতে পারে।

কোবটের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এসবের মধ্যে মানবিক নিরাপত্তাসংবলিত কোবট এমনভাবে তৈরি করা হয়, যা সাধারণত নিরাপদ এবং মানুষের সঙ্গে কাজ করার সময় শারীরিক আঘাত বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে সহায়ক। তা ছাড়া কোবট দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও বেশি কার্যকর হতে পারে। কারণ, এটি কাজের পরিমাণ বাড়ায় এবং একসঙ্গে একাধিক কাজ

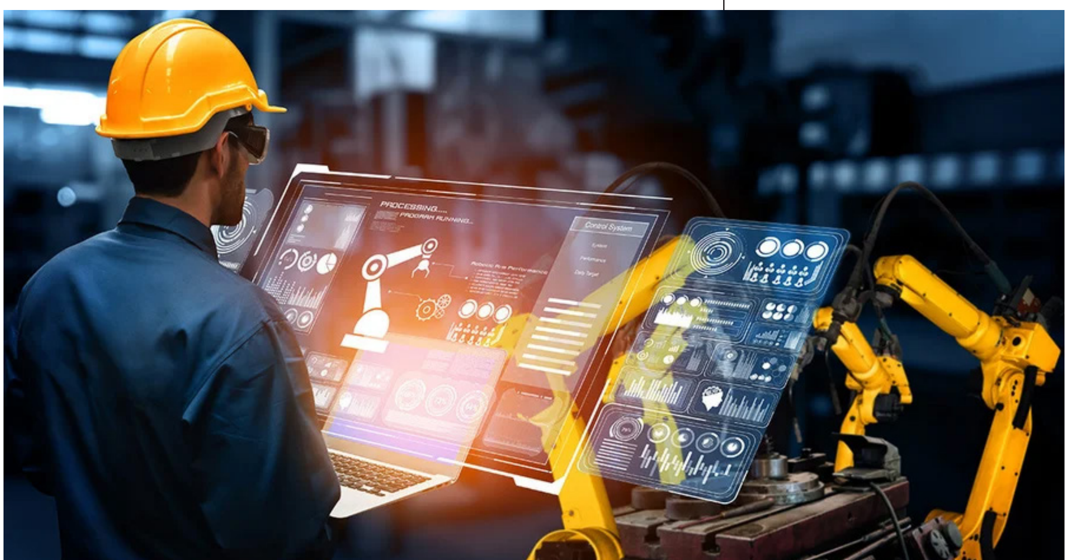

করতে সক্ষম। কোবট একটানা দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে, শ্রমিকদের কাজের চাপ কমিয়ে দিতে পারে। তাই এর ব্যবহারে উৎপাদন খরচ কমানো সম্ভব। ফলে মূলত কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ও আয় দুটিই বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া কোবটের নকশা এমনভাবে করা হয় যে মানুষের জন্য ক্লান্তিকর হতে পারে, এমন সব কাজ এটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সক্ষম। বারবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।

কোবট প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক না কেন, এর কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন কোবটের প্রোগ্রামিং ও রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত বেশ জটিল এবং এতে উচ্চতর দক্ষতা প্রয়োজন হয়। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানব-রোবট সম্পর্ক, অর্থাৎ কোবটের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং এটি নিশ্চিত করা যে কোবট কাজ করার সময় মানুষের নিরাপত্তা বজায় রাখবে। যদিও কোবট কাজের দক্ষতা বাড়ায়, তবে তার প্রাথমিক খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এখনো অনেক ব্যবসার জন্য একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিছু চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও কোবট প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে কোবট আরও স্মার্ট, নিরাপদ ও সহজলভ্য হয়ে উঠবে। এতে মানব-রোবট সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হবে এবং তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আরও বেশি ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণশিল্প ও পরিবহন খাতে কোবটের ব্যবহার বাড়বে। তাই সব মিলিয়ে কোবট বা কলাবোরেটিভ রোবট মানবসমাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এগুলো শিল্প, উৎপাদন ও সেবা খাতে কাজের ক্ষেত্রকে এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিতে সহায়তা করবে। কোবটের মাধ্যমে মানুষ ও যন্ত্র একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারবে। ফলে উন্নত ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কাজের দক্ষতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার কমছে শারীরিক শ্রম

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এমন এক ধরনের ইন্ডাস্ট্রিজ, সার্ভিস ও প্রশাসন সৃষ্টির পথ খুলে দিয়েছে যেখানে কায়িক শ্রমিকদের চাহিদা দ্রুত কমছে। ভবিষ্যতের নিকট সময়ে রুটিন কাজগুলো মেশিনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। ফলে এসব খাতে শ্রমশক্তির প্রাসঙ্গিকতা কমতে পারে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা মূলত স্বয়ংক্রিয়তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক প্রভাব থেকে উদ্ভূত। যদিও এ উদ্বেগ যুক্তিসংগত, তবে শ্রমবাজার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়ে কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সে বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে বাংলাদেশে, যেখানে জনসংখ্যা প্রায় ১৮০ মিলিয়ন, তার মধ্যে ১৫-২৪ বছর বয়সী প্রায় ৫৪ মিলিয়ন তরুণ রয়েছে, যারা কর্মজীবনে প্রবেশের অপেক্ষায়। প্রতি বছর এ দেশে দুই থেকে ২ দশমিক ২ মিলিয়ন তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। অন্যদিকে শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অদক্ষ বা কম দক্ষ হওয়ার কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সংকুচিত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বৈশ্বিক বাজারের আন্তঃসংযুক্ততা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রয়াসে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারবে না। এসব প্রেক্ষাপটে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে লক্ষ্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-এর সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা তাদের নিজস্ব ইতিহাস, সম্পদ ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জানা দরকার যে এশীয় দেশগুলো কীভাবে এসব সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে অভিযোজনশীল নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

সিঙ্গাপুর তার ছোট আকার এবং কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মশক্তিকে কেন্দ্র করে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। চীন নির্মাণ শিল্প এবং অবকাঠামোগত আধিপত্য থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার দিকে রূপান্তর করেছে। জাপান ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোকে উন্নত রোবোটিকস এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে উচ্চ

মূল্যের উৎপাদন এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ধরে রেখেছে। ভারত আইটি ও ডিজিটাল সার্ভিস প্রসারকে শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উনয়নের উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিচালনা করছে।

এ উদাহরণগুলো দেখায় যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে অর্থনৈতিক উনয়নের জন্য কোনো সর্বজনীন মডেল নেই; প্রতিটি দেশকে তাদের স্থানীয় অগ্রাধিকার এবং বৈশ্বিক সুযোগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে নিজস্ব প্রেক্ষাপটনির্ভর কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। ঘনবসতিপূর্ণ একটি উন্নয়নশীল দেশ ও ক্রমবর্ধমান যুব জনগোষ্ঠীর অধিকারী বাংলাদেশ এমন কিছু স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের মুখোমুখি, যা একটি প্রাসঙ্গিক এবং লক্ষ্যভিত্তিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে। যুব জনগোষ্ঠীর এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে কাজে লাগাতে হলে তথ্যপ্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং, ই-কমার্স, বিজনেস অ্যানালিস্ট, ব্লকচেইন ডেভেলপার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও হালকা প্রকৌশলসহ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী খাতগুলোয় দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বর্তমানে কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তৈরি পোশাক (আরএমজি), আইসিটি/সফটওয়্যার, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য এবং হালকা প্রকৌশল খাতগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চালিত করছে। এ শ্রমনির্ভর শিল্পগুলোর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ধীরে ধীরে অটোমেশন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে আকস্মিকভাবে কর্মসংস্থান হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কা না থাকে। তবে ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাকে সীমিত করে।

বাংলাদেশের জন্য জরুরি অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে শিল্প খাতের বৈচিত্র্যকরণ, স্টার্টআপ ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে (এসএমইএস) উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) বিনিয়োগ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এবং সবুজ প্রযুক্তির মতো আধুনিক খাতে স্থানীয় দক্ষতা তৈরি করা। বাংলাদেশকে এমন উদ্ভাবনী নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, যা স্থানীয় সমস্যার সমাধানে মনোযোগ দেয়, যেমন টেকসই কৃষি, দুর্যোগ সহনশীলতা ও নগরায়ণ। পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশকে ভারী শিল্প উৎপাদন এবং মৌলিক গবেষণার পরিবর্তে প্রয়োগভিত্তিক উদ্ভাবনী গবেষণায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বৃহৎ জনসংখ্যার কারণে একটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মশক্তি তৈরির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, যা উদ্ভাবনী পরিবর্তন সাধনে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি করতে হলে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে। এর মূল ভিত্তি হবে সেই ধরনের শিক্ষা নির্ধারণ করা, যা কর্মশক্তিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-এর জন্য কার্যকরভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম।

ফরাসি চিন্তাবিদ রেনে দেকার্তের যুক্তিবাদী দার্শনিকতায় গভীরভাবে প্রভাবিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা মডেল চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের রূপান্তরমূলক চাহিদা পূরণে আর যথেষ্ট নয়। দেকার্তের দ্বৈতবাদী দর্শন, যা মন ও শরীরকে আলাদা করে দেখায়, একটি যুক্তিবাদী শিক্ষা মডেলের ভিত্তি স্থাপন করেছিল, যেখানে বৌদ্ধিক যুক্তি প্রাধান্য পায় এবং সংবেদনশীল বা আবেগীয় অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা হয়। যৌক্তিক যুক্তির প্রয়োগ এবং বিষয়ভিত্তিক বিশেষায়ণকে গুরুত্ব দিয়ে এ পদ্ধতি উচ্চ শিক্ষাকে এককালীন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছে, যেখানে শিক্ষকরা জ্ঞানের সরবরাহকারী এবং শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের প্যাসিভ গ্রহণকারী। যদিও এটি একটি মৌলিক ভিত্তি প্রদান করেছে, দেকার্তীয় মডেল এর গতিশীল চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয়। জন ডিউই, পাওলো ফ্রেইরে, রুডলফ স্টেইনার, কার্ল রজার্স, জাঁ পিয়াজে এবং বেল হুকসের মতো চিন্তাবিদরা বিকল্প পদ্ধতির পক্ষে মত দিয়েছেন, যা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, আন্তঃবিষয়ক এবং প্রাসঙ্গিক সম্পৃক্ততাকে গুরুত্ব দেয়। এ কাঠামো শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

দেকার্তীয় কাঠামোর কঠোরতাকে এই অ-দেকার্তীয় মডেলের সঙ্গে একীভূত করা বিষয়ভিত্তিক বিশেষায়নের পাশাপাশি উদ্ভাবনকেও ভারসাম্যপূর্ণ করতে পারে, যা স্নাতকদের অরৈখিক কর্মজীবন ও উদীয়মান ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করবে।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই একীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষকদের উচিত পরিবর্তনের প্রতি ঐতিহ্যগত প্রতিরোধের মানসিকতা থেকে সরে আসা এবং উচ্চ শিক্ষায় প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা, যা উদ্যমী ও প্রাণবন্ত তরুণ প্রজন্মের জন্য উপকারী হবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে বিলম্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বাড়িয়ে তুলবে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সম্ভাবনাগুলো হাতছাড়া করার ঝুঁকি তৈরি করবে। ইন্ডাস্ট্রিজে বৈচিত্র্য আনয়ন, শিক্ষার আধুনিকীকরণ এবং উদ্ভাবনের প্রসার ঘটিয়ে বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে। পদক্ষেপ নেয়ার সময় এখনই।

কৃষিতে রোবটের ব্যবহার বাড়ছে

নানা কারণে কৃষি খাতে কাজের আগ্রহ কমছে মানুষের। কিন্তু মানুষ কর্মীদের অভাব পুষিয়ে দিতে পারে রোবট। এরই মধ্যে অনেক রোবট কৃষক কৃষিকাজে সফলতাও দেখিয়েছে। চিকিৎসা, শিল্প থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ, বসত বাড়ির পর এবার কৃষি ও মৎস্য শিল্পের জন্য রোবট তৈরি করেছে উন্নত দেশগুলো। শীর্ষে আছে জাপান। উচ্চ ফলনশীল কৃষিপণ্য ও লোকবলের চাহিদা কমাতে নতুন এই পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটি। জাপানে কৃষকদের গড় বয়স ৬৪ বছর। বয়স্ক কৃষকদের শ্রম লাঘবের জন্য তারা নির্মাণ করে চলেছে কৃষক রোবট। বিগত বছরগুলোতে তারা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ ধরনের রোবট তৈরির জন্য ১২০ কোটি জাপানি মুদ্রা বরাদ্দ দিয়েছে। এই লক্ষ্যে গবেষকরা অর্ধেকের বেশি রোবট আবিষ্কার করেন কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে। সম্প্রতি কৃষিতে রোবটের ব্যবহারকে বৈপ্লবিক জয় আখ্যা দিয়ে জাপানের ওকায়েমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইচি

ইয়াগি বলেছেন যে, সাধারণত একজন কৃষক দুই হাতে কাজ করতে পারে এবং মাত্র সাত-আট কেজি ওজন বহন করতে পারে। কিন্তু তাদের উদ্ভাবিত কিছু কিছু রোবট মানুষের বুকে কিংবা কনুইয়ে বাঁধা থাকে, যার মাধ্যমে সে ২০ কেজির বেশি কমলার ঝুড়ি বহন করতে পারে। এছাড়া আগাছা বাছাইয়ের জন্যও কিছু রোবট আবিষ্কার করা হয়েছে, যা দিয়ে মাত্র এক ঘণ্টায় প্রায় ৮০০ বর্গমিটার ফসলি জমি পরিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্বে এখন ৮০০ কোটি মানুষের আহার জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন কৃষক। জাতিসংঘের অনুমান, ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে হবে প্রায় ৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন। এত মানুষের খাদ্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় পড়বে কৃষকসমাজ। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে কৃষিখাত। সময়ের প্রয়োজনে তাই টেকসই চাষাবাদ করা অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু কৃষিতে তরুণদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। সুতরাং ভবিষ্যতে জনবল সংকটে পড়তে পারে এ খাত। বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে টেক জায়ান্টদের। তারা শুধু খাদ্য সমস্যা সমাধানই নয়, তরুণদের সম্পৃক্ত করে কৃষিব্যবস্থাকে উচ্চপ্রযুক্তির ব্যবসায় কিভাবে পরিণত করা যায় সেদিকে এগোচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের ওয়াজেনিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ম টেকনোলজি গ্রুপের প্রধান এলডার্ট ভ্যান হেন্টেন বলেন, খুব কম মানুষই ভোরে ঘুম থেকে উঠে কৃষিজমিতে যেতে চান। তবে কৃষি প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটলে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে। এমনকি কৃষি ছেড়ে অন্য ব্যবসায় চলে যাওয়া বিনিয়োগকারীরাও ফিরে আসবেন এ পেশায়। ইতোমধ্যে রোবটিক ফার্মিং নিয়ে ইউরোপে নানা প্রকল্প চালু হয়েছে। এসব রোবটের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষি কাজকে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যেমন- ১. স্বয়ংক্রিয় রোপণ এবং বীজ বপন। যথার্থ রোপণ- রোবট সর্বোত্তম গভীরতা এবং ফাঁকে বীজ রোপণ করতে পারে, ভালো ফসলের ফলন নিশ্চিত করতে এবং বীজের অপচয় কমাতে পারে। ২. পরিবর্তনশীল হার বীজ- উন্নত রোবট মাটির অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রোপণের হার সামঞ্জস্য করতে পারে, সম্পদের ব্যবহার অনুকূল করে। ৩. ফসল পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা- ড্রোন এবং সেন্সর- ক্যামেরা এবং সেন্সর দিয়ে সজ্জিত ইউএভি (ড্রোন) ফসলের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করতে পারে, বৃদ্ধির পর্যায়গুলো মূল্যায়ন করতে পারে এবং বায়বীয় চিত্রের মাধ্যমে কীট বা রোগের প্রাদুর্ভাব শনাক্ত করতে পারে। ৪. ডেটা সংগ্রহ- রোবটগুলো মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং পুষ্টির স্তরের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, কৃষকদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। ৫. আগাছা এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ- স্বয়ংক্রিয় আগাছা- রোবটগুলো উচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে আগাছা শনাক্ত করতে এবং অপসারণ করতে পারে, রাসায়নিক ভেষজনাশকের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করতে পারে এবং ফসলের ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।

৬. লক্ষ্যযুক্ত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা- রোবটগুলো সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কীটনাশক বা জৈবিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে, রাসায়নিক ব্যবহার এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করতে পারে। ৭. ফসল কাটা-রোবটিক হার্ভেস্টার- স্বয়ংক্রিয় ফসল কাটার মেশিন ফল ও সবজি বাছাই করতে পারে প্রায়ই মানুষের শ্রমিকদের চেয়ে বেশি যত্ন সহকারে, নষ্ট হওয়া এবং শ্রমের খরচ কমিয়ে। যথার্থ ফসল কাটা- রোবট ফসলের পরিপক্বতা শনাক্ত করতে পারে, নিশ্চিত কওে যে শুধু পরিপক্ব ফসল কাটা হয়, যা গুণমান এবং বাজার মূল্য উন্নত করতে পারে। ৮. মাটি এবং ফসল বিশ্লেষণ- মাটি পরীক্ষা- সেন্সর দিয়ে সজ্জিত রোবটগুলো পুষ্টির মাত্রা এবং পিএইচ নির্ধারণ করতে মাটি পরীক্ষা করতে পারে, যা কৃষকদের মাটি ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ৯. ফসলের স্বাস্থ্য মূল্যায়ন- পাতার রং এবং গঠন বিশ্লেষণ করে, রোবট উদ্ভিদের স্বাস্থ্য মূল্যায়ন করতে পারে এবং সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করতে পারে। ১০. সেচ ব্যবস্থাপনা- স্বয়ংক্রিয় সেচ ব্যবস্থা- রোবটগুলো সঠিকভাবে কখন এবং কোথায় পানি সরবরাহ করে, জল সংরক্ষণ করে এবং ফসলের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে সেচকে অপ্টিমাইজ করতে পারে। স্মার্ট সেন্সর- এগুলো রিয়েল-টাইম আবহাওয়া ডেটা এবং মাটির আর্দ্রতার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সেচ সামঞ্জস্য করতে পারে। ১১. প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা- পশু স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ- রোবট স্বাস্থ্য সমস্যা, আচরণ পরিবর্তন এবং খাওয়ানোর ধরনগুলোর জন্য পশুসম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। কৃষকদের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

অটোমেটেড ফিডিং সিস্টেম- রোবট প্রাণীদের খাদ্য এবং পানি সরবরাহ করতে পারে, সম্পদ বিতরণকে অনুকূল করে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ যত্ন নিশ্চিত করতে পারে। ১২. লজিস্টিকস এবং সাপ্লাই চেইন- স্বয়ংক্রিয় পরিবহন- রোবটগুলো খামারের মধ্যে পণ্য পরিবহন করতে পারে, শ্রমের খরচ কমাতে পারে এবং পণ্যগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের এলাকায় বা স্টোরেজে স্থানান্তর করতে পারে। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট - ড্রোন এবং রোবটগুলো ইনভেন্টরি লেভেল ট্র্যাক করতে এবং সরবরাহ পরিচালনা, অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

বর্তমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং নিকটবর্তী পঞ্চম শিল্প বিপ্লব উপযোগী ভবিষ্যতের কৃষি রোবট কেমন হতে পারে, তার ধারণাও দিয়ে যাচ্ছে বর্তমান প্রযুক্তিবিদ ও টেক জায়ান্টরা। ধারণাগুলো হলো- ১. এআই এবং মেশিন লার্নিংয়ের সঙ্গে একীকরণ- এআই প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোবটগুলো ডেটা থেকে শেখা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পারদর্শী হয়ে উঠবে। কৃষিতে তাদের উপযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। ২. স্থায়িত্ব এবং সম্পদের দক্ষতা- রোবট টেকসই কৃষি অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যেমন- নির্ভুল কৃষি, যা সম্পদের ব্যবহার এবং পরিবেশগত প্রভাবকে হ্রাস করে। ৩. শ্রমের ঘাটতি মোকাবিলা করা- কৃষিতে চলমান শ্রম ঘাটতির সঙ্গে রোবট শূন্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে, যাতে খাদ্য উৎপাদন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দক্ষ থাকে। ৪. গ্রামীণ উন্নয়ন- রোবটিক প্রযুক্তি গ্রহণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করতে পারে, প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে। ৫. বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা- বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোবটগুলো খাদ্য উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মুখে খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখবে। পরিশেষে, কৃষিকাজ এবং কৃষিতে রোবটের ব্যবহার বর্ধিত দক্ষতা এবং শ্রমের ব্যয় হ্রাস থেকে উন্নত স্থায়িত্ব এবং ফসলের গুণমান পর্যন্ত অসংখ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে। রোবটগুলো চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারে, কখনো বিরতির প্রয়োজন হয় না, যা উৎপাদনশীলতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। পাশাপাশি শ্রমের ঘাটতি কৃষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। রোবট সে স্থানটি পূরণ করতে সাহায্য করবে।

রোবট এখন শিক্ষা ও গবেষণা সহায়তা করছে

ওয়াটসন আইবিএমের একটি রোবটিও কম্পিউটার যা প্রাকৃতিক ভাষায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। এটি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং শাখার একটি অত্যন্ত সফল শো হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম 'জ্ঞানমূলক' পরিষেবা হিসেবে ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে। এর অ্যালগরিদমগুলো খুব সহজেই ইমেজ রিকগনিশন, সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, স্পিচ-টু-টেক্সট ইত্যাদি দরকারি এপ্লিকেশনগুলোকে একত্রিত করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে পারে। সিস্টেমটি প্রাথমিকভাবে জনপ্রিয় কুইজ শো জেওপার্ডি'র প্রশ্নের উল্টর দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং ২০১১ সালে 'ব্র্যাড রুটার' এবং 'কেন জেনিংস'র বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম পুরস্কার (এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জিতে নেয়। বর্তমানে আইবিএম ওয়াটসন বিভিন্ন শিল্প বিপ্লব, ব্যবসায়িক দক্ষতা, অনুসন্ধান এবং উদ্ভাবনী কাজে ব্যাপক

সাফল্য দেখাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো হচ্ছে : ১. প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে ওয়াটসনকে এমনভাবে মানুষের ভাষা বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং তৈরি করতে দেয় যা মানুষের বোঝার অনুকরণ করে। এটি ওয়াটসনের পাঠ্য, বক্তৃতা এবং অন্যান্য ভাষার পদ্ধতি প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা দেয়, চ্যাটবট, ভার্চুয়াল সহকারী, স্পিচ-টু-টেক্সট এবং অনুভূতি বিশ্লেষণের মতো এপ্লিকেশনগুলোকে সক্ষম করে। এর এনএলপি ক্ষমতা এটিকে নথি, ইমেল বা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অসংগঠিত পাঠ্য বিশ্লেষণ করতে, অন্তর্দৃষ্টি বের করতে বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুমতি দেয়। ২. মেশিন লার্নিং : মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ওয়াটসনকে প্রতিটি কাজের জন্য সুস্পষ্ট প্রাগ্রামিংয়ের প্রয়োজন ছাড়াই ডেটা, প্যাটার্ন এবং অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে উন্নতি করতে দেয়। এটি এমএল ব্যবহার করে বড় ডেটাসেট বিশ্লেষণ করতে, ভবিষ্যদ্বাণী করতে এবং ঐতিহাসিক ডেটার ওপর ভিত্তি করে সুপারিশ প্রদান করে। যেমন- ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে পারে, প্রবণতা চিনতে পারে এবং সুপারিশ করতে পারে, যেমন স্বাস্থ্য ডায়াগনস্টিকস বা ব্যবসায়িক কৌশল। ৩. গভীর শিক্ষা : ডিপ লার্নিং হল মেশিন লার্নিংয়ের একটি উপসেট যা মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা অনুকরণ করতে নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। এই নেটওয়ার্কগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডোঁ থেকে শেখার, নিদর্শনগুলো চিনতে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি চিত্র শনাক্তকরণ, বক্তৃতা শনাক্তকরণ এবং অন্যান্য প্যাটার্ন-ভিত্তিক বিশ্লেষণের মতো জটিল কাজের জন্য গভীর শিক্ষা ব্যবহার করে। ছবি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, যেমন মেডিক্যাল ইমেজিংয়ে (টিউমার শনাক্ত করা), গভীর শিক্ষা লাভ করে। ৪. জ্ঞানীয় কম্পিউটিং : জ্ঞানীয় কম্পিউটিং হল কম্পিউটারে মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ার অনুকরণ। ওয়াটসনকে জ্ঞানীয় কম্পিউটিং ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে অসংগঠিত ডেটা বিশ্লেষণ করে (যেমন পাঠ্য, ভিডিও এবং অডিও) এবং মানুষের মতো অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করে। এটি ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আরও মানবিক পদ্ধতিতে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, সুপারিশ প্রদান করে, প্রসঙ্গ বুঝতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। যেমন গ্রাহক পরিষেবায়, ওয়াটসন একজন গ্রাহকের প্রশ্ন বুঝতে পারে, এটিকে প্রাসঙ্গিকভাবে প্রক্রিয়া করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিক সমাধান অফার করতে পারে, একজন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে। ৫. স্পিচ রিকগনিশন এবং স্পিচ-টু-টেক্সট : ওয়াটসন কথ্য ভাষাকে পাঠ্যে রূপান্তর করতে স্পিচ রিকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এটি ব্যবহারকারীদের ভয়েস কমান্ড বা প্রশ্নের মাধ্যমে ওয়াটসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়। ওয়াটসনের স্পিচ-টু-টেক্সট প্রযুক্তি ভয়েস সহকারী থেকে কল সেন্টার অটোমেশন এবং ট্রান্সক্রিপশন পরিষেবা পর্যন্ত বিস্তৃত এপ্লিকেশন সক্ষম করে। যেমন- আইবিএম ওয়াটসন মূল তথ্য বা অনুভূতি বের করতে কল বা মিটিং থেকে অডিও প্রতিলিপি এবং বিশ্লেষণ করতে পারে। ৬. কম্পিউটার দৃষ্টি : কম্পিউটার দৃষ্টি ওয়াটসনকে ছবি এবং ভিডিওর মতো ভিজ্যুয়াল ডেটা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে দেয়। দৃষ্টি ক্ষমতাগুলো ইমেজ রিকগনিশন, ফেসিয়াল রিকগনিশন, অবজেক্ট ডিটেকশন এবং মেডিকেল ইমেজ অ্যানালাইসিসের মতো কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন- ওয়াটসন ভিজ্যুয়াল রিকগনিশন চিত্রগুলোতে বস্তুগুলি শনাক্ত করতে এবং শ্রেণিবিদ্ধ করতে পারে। যেমন- খুচরা পণ্যগুলো শনাক্ত করা বা মেডিক্যাল স্ক্যানগুলোতে স্বাস্থ্যের অবস্থা শনাক্ত করা। ৭. স্বয়ংক্রিয় যুক্তি এবং জ্ঞান গ্রাফ : স্বয়ংক্রিয় যুক্তি ওয়াটসনকে ডেটা এবং প্রসঙ্গের ওপর ভিত্তি করে যৌক্তিক অনুমান করতে সক্ষম করে। ওয়াটসন জ্ঞানের গ্রাফ ব্যবহার করে বিভিন্ন সত্তার মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করতে এবং বৃহৎ পরিমাণের কাঠামোগত এবং অসংগঠিত ডোঁ বোঝাতে। ওয়াটসনের যুক্তির ক্ষমতাগুলো জটিল প্রশ্নের যৌক্তিক উত্তর প্রদান করতে এবং অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কার করতে বিশাল ডেটাসেট বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- স্বাস্থ্যসেবায় ওয়াটসন লক্ষণ, চিকিৎসা ইতিহাস এবং অন্যান্য ডেটা পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য রোগ নির্ণয়ের সুপারিশ করার জন্য মেডিক্যাল ডেটার মাধ্যমে যুক্তি দিতে পারে।

৮. রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন: ডিজিটাল সিস্টেমের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়া অনুকরণ করে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করে। এটি ওয়ার্কফ্লোগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করতে, যেমন- ইনভয়েস প্রক্রিয়াকরণ, ডেটা এন্ট্রি বা রুটিন কাজগুলো পরিচালনা করার জন্য তার এআই ক্ষমতাগুলোর সঙ্গে কে একীভূত করে। ওয়াটসন সাধারণ অনুসন্ধানে সাড়া দিয়ে এবং মানব এজেন্টদের কাছে আরও জটিল মামলা রুট করে গ্রাহক সহায়তা প্রক্রিয়াগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করতে সহায়তা করতে পারে। ৯. ডেটা মাইনিং এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ : ওয়াটসনের ডেটা মাইনিং ক্ষমতাগুলো এটিকে বিশাল ডেটাসেট থেকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি বের করতে সক্ষম করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ডেটার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের প্রবণতাগুলোর পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিপণনের মতো বিভিন্ন শিল্পে ডেটা মাইনিং এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মডেল প্রয়োগ করে। স্বাস্থ্যসেবায়, ওয়াটসন রোগীর ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্য ঝুঁকির পূর্বাভাস দিতে পারে, যেমন- একটি নির্দিষ্ট অবস্থার বিকাশের সম্ভাবনা। ১০. ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এআই ইন্টিগ্রেশন : ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে একীভূত করে পরিমাপযোগ্য এআই পরিষেবা সরবরাহ করে এবং এপিআই-এর মাধ্যমে ওয়াটসনের এআই টুলগুলোতে সহজে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়। ক্লাউডে ওয়াটসন চালানোর সঙ্গে, ব্যবহারকারীরা ভারী পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছাড়াই এনএলপি, মেশিন লার্নিং এবং ডেটা বিশ্লেষণের মতো এআই বৈশিষ্ট্যগুলোকে তাদের নিজস্ব অ্যাপিকেশনগুলোতে একীভূত করতে পারে। যেমন- ক্লাউডে উপলব্ধ ওয়াটসনের পরিষেবাগুলো ব্যবহার করে বিকাশকারীরা এআইচালিত এপ্লিকেশনগুলো (যমন- চ্যাটবট বা সুপারিশ ইঞ্জিন) তৈরি করতে পারে।

১১. এপিআই এবং ওয়াটসন স্টুডিও : ওয়াটসন এপিআই-এর একটি স্যুট (এপ্লিকেশন প্রোগামিং ইন্টারফেস) প্রদান করে যা ডেভেলপারদের ওয়াটসনের বিভিন্ন এআই টুল, যেমন ভাষা প্রক্রিয়াকরণ, ভিজ্যুয়াল রিকগনিশন এবং আরও অনেক কিছু অ্যাক্সে করতে দেয়। ওয়াটসন স্টুডিও হল এআই মডেল তৈরি এবং মেশিন লার্নিং প্রকল্প চালানোর একটি প্ল্যাটফর্ম। এটি বিকাশকারীরা ওয়াটসনের জ্ঞানীয় পরিষেবাগুলোকে পূর্ব-নির্মিত এপিআই ব্যবহার করে বা ওয়াটসন স্টুডিওর মাধ্যমে এন্ড-টু-অ্যান্ড এআই বিকাশের জন্য কাস্টম এপ্লিকেশনগুলিতে একীভূত করতে পারে। যেমন- একটি কোম্পানি একটি কাস্টম চ্যাটবট তৈরি করতে ওয়াটসন এপিআই ব্যবহার করতে পারে যা গ্রাহকের প্রশ্নগুলো বোঝে এবং লেনদেন প্রক্রিয়া করে। রোবটের আরও বহু কিছু ব্যবহার আছে। টেলিভিশনে খবর পড়া, উপস্থাপন করা, রেস্টুরেন্ট এবং আবাসিক কাজকর্মে রোবটের ব্যবহার এখন নিয়মিত ব্যাপার। চীন, জাপান এবং অনেক উন্নত দেশে রোবট দিয়ে জমি চাষাবাদ থেকে শুরু করে ফসল ফলানো এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সবই করছে রোবটের মাধ্যমে। সম্প্রতি ‘ডিজিট’ নামের এক নতুন প্রজন্মের রোবট মানুষের মতোই দুই পায়ে হেঁটে পণ্য বহন করতে সক্ষম। ফলে এটি কর্মীদের শারীরিক শ্রমের চাপ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, রোবটের এই বিপ্লব কিছু মানুষের জন্য নতুন দুশ্চিন্তা তৈরি করেছে। বিশেষ করে যেসব কাজ রোবট সহজে করতে পারছে, সেসব কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত। তবে বাস্তবতা হলো, প্রযুক্তি সবসময় মানুষের সহায়ক হিসেবে কাজ করে আসছে। কোথাও কোথাও মানুষ এবং রোবট একসঙ্গেই কাজ করছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও নিরাপদে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

শিক্ষা ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর ব্যবহার

হীরেন পণ্ডিত
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

প্রযুক্তির দুনিয়ায় বর্তমানে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। শুধু চর্চা নয়, বেড়েছে ব্যবহারও। মানবসভ্যতার উন্নয়নে এ প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে চলছে গবেষণা। আর সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারই প্রবেশ ঘটেছে শিক্ষা ক্ষেত্রেও। সেটা ভালো হবে কী মন্দ হবে, তা নিয়ে চলছে অনেক বিতর্ক। তবুও এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর একটি বিশ্ব আমাদের তৈরি হবে। আর সেই বিশ্বে পদচারণা করবে আজকের দিনের নতুন প্রজন্ম; আপনার আমার সন্তানরা। সেই বিশ্বে আমাদের সন্তানরা কেমন করবে, তা অনেকখানিই নির্ভর করবে তাদের ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি জ্ঞানের উপর’। তাই বর্তমান বিশ্বের অভিভাবকরা চাচ্ছেন তাদের সন্তানরা যেন শৈশব থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর বেসিক কিছু জ্ঞান অর্জন করে। আজকের দিনে মানুষ বেশিরভাগ সময় মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে, কম্পিউটার ও মোবাইলের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কীভাবে এ অ্যাপ্লিকেশন এবং ওয়েবসাইটগুলো তৈরি হয় তা অনেকেরই অজানা। তাই আপনাদের জানিয়ে রাখি, এসব কিছু কোডিংয়ের সাহায্যে তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোডিং সম্পর্কে অনেকের ধারণা খুবই কম। কম্পিউটার কোডিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে কম্পিউটারের প্রোগ্রামগুলো ডিজাইন করা হয়। কম্পিউটারে যেসব অপারেশন করা হয়, সেগুলো কম্পিউটার কোডিংয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারে। এর কারণ কম্পিউটার শুধু কোডিং ভাষা বোঝে। আমরা যদি কম্পিউটারকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাই, তাহলে কোডিংয়ের মাধ্যমে কম্পিউটারকে সেটি জানাতে হবে। আজকের দিনে আধুনিক কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, সফটওয়্যার, গেমস, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, মেশিন লার্নিং, ওয়েবসাইট, অ্যাপস- সবকিছুর মধ্যেই কোডিং ব্যবহার করা হয়। কোডিংয়ের সাহায্যে নির্দিষ্ট একটি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় এবং এ প্রোগ্রামগুলোর সাহায্যে কম্পিউটার নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে। কোডিং কেন শিখতে হবে, তার অনেক কারণ আছে, যার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-১. কোডিং সমস্যা-সমাধানে দক্ষ করে তোলে; ২. চিন্তা করতে শেখায়; ৩. একাডেমিক কর্মক্ষমতা

উন্নত করে; ৪. সৃজনশীলতা বাড়ায়; ৫. ভালো কম্পিউটার প্রোগ্রামার হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়; ৬. সফটওয়্যার শিল্পে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়; ৭. শিশুদের গণিত শেখা আনন্দদায়ক করে তুলে; ৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করে; ৯. এটি শিখলে পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে দক্ষতার নতুন মাত্রা যোগ করা যায়; ১০. এটি শিখলে পেশাদারদের কাজগুলোও করা যায়, ফলে কাজের দক্ষতা উন্নত হয়।

বিশ্বে ৭০০টিরও বেশি প্রোগ্রামিং ভাষা রয়েছে, যেগুলো বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় কিছু প্রোগ্রামিং ভাষা হলো : সিপ্লাস প্লাস, জাভা, পাইথন, জাভাস্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপিসহ আরো অন্যান্য। তবে কোডিং শেখার জন্য, প্রথমে সহজ ও বহুমুখী ভাষা দিয়ে শুরু করা ভালো।

অন্যদিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হলো, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। এটি বিজ্ঞানের জগতে এক অনন্য আবিষ্কার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, যন্ত্র বা অ্যাপ্লিকেশনকে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির আদলে কাজের উপযোগী করা যায়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী জন ম্যাকার্থি। এজন্য তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক বলা হয়। তারও আগে ১৯৫০ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিং কোনো যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা ‘টুরিং টেস্ট’ নামে পরিচিত। বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ নেই। তবে উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিল্প-কলকারখানা, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, যুদ্ধক্ষেত্র, কৃষিকাজ, পণ্য পরিবহণ, দৈহিক শ্রম, চালকবিহীন বিমান বা গাড়ি চালানো, কোডিং লেখা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মাইক্রোসফটের সিইও মোস্তাফা সুলেমান জানিয়েছেন, এবার শুধু কাজই নয়, এআই মানুষের মতোই কথা বলবে এবং আচরণ করবে। সম্প্রতি জাপানে স্যাটেলাইট টিভিতে সংবাদ উপস্থাপনের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট ব্যবহার করা হয়েছে, যা বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। এদিকে টেক জায়ান্ট গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাই জানিয়েছেন, গুগলের নতুন সব সফটওয়্যার ডেভেলপ ২৫ শতাংশেরও বেশি কোড তৈরি করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)।

বাংলাদেশে কিছু কিছু খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার শুরু করলেও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর জন্য দরকার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দক্ষ

জনশক্তি। বর্তমান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে ইন্টারনেট স্পিড। মোবাইল ইন্টারনেটের গতিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। ওয়েব সার্ভিস প্রতিষ্ঠান স্পিডটেস্টের মার্চ ২০২৪-এর সূচকে এমন চিত্র উঠে এসেছে। মোবাইল ইন্টারনেটের পাশাপাশি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সূচকেও বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১০৮তম, যেটি এআই টুলস ব্যবহারের অন্তরায়।

দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ, এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও তাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে কোডিং ও এআই প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলামেও নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে কোডিং, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট এআই টুলস ও ওয়েব ডেভেলপিং ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রযুক্তি জ্ঞানে আমরা আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে আর পেছনে দেখতে চাই না। আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলামে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে কোডিং, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট এআই টুলস ও ওয়েব ডেভেলপিং ভাষা অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিশ্ব নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা দরকার।

এ লক্ষ্যে প্রতিবছর সরকারিভাবে উপজেলা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্কুল প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা প্রয়োজন। এয়াড়াও দেশের সব মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে শিক্ষকদের প্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ করে কোডিং ও এআই টুলসসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। একইসঙ্গে স্কুলগুলোর লাইব্রেরিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক বইয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ করা দরকার। পরিশেষে, আমাদের দেশের স্কুল শিক্ষার্থীরা যেন কোডিং তথা লজিকের খেলায় পিছিয়ে না পড়ে, সে আশাবাদ সবার।

বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংমিশ্রণের ঝুঁকি

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রযুক্তি, আইনি সহায়তা এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে ন্যায়বিচারকে আরো সহজলভ্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা জনগণের কাছে সহজলভ্য, জবাবদিহিতামূলক, স্বচ্ছ, হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত এবং গতিশীল করার জন্য এখনো ব্যাপকভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। যদিও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া বা প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও প্রচলিত পদ্ধতির সংস্কার কিছুটা হলেও পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত সনদ সত্যায়নে ভোগান্তি কমাতে সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত সেবা অনলাইনে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এরপরও বিচার বিভাগে বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমাতে এবং আদালতের দৈনন্দিন কার্যক্রমে গতিশীলতা নিশ্চিতে ও দুর্নীতি রোধে বিচার বিভাগকে ডিজিটালাইজ করার প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনো দৃষ্টিগোচর নয়।

আদালতের অধিকাংশ বিচারিক কার্যক্রম অদ্যাবধি সেকেলে ব্যবস্থায় ম্যানুয়ালি পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের উচ্চ ও অধস্তন উভয় আদালতে মূলত প্রযুক্তির সীমিত সংমিশ্রণে নাগরিকদের সেবা প্রদান ও বিচার নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের, বণ্টন, বিচার, সেবাগ্রহীতা বা বিচারপ্রার্থীদের মামলার বিভিন্ন বিষয়ে অবগতকরণ, সনদ দাখিল, উত্তোলন, সরবরাহ প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই সাধারণত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না। এর ফলে নিষ্পত্তিতে ধীরগতি এবং বিচারপ্রার্থীদের নানা ভোগান্তির অবসান হচ্ছে না।

অথচ পৃথিবীর অনেক দেশেই বর্তমানে সময়, রাষ্ট্রের খরচ এবং আদালতের শ্রম কমাতে ও আদালতের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে তাদের বিচার ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি, যথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), বৃহৎ ভাষা মডেল (এলএলএম), মেশিন লার্নিং (এমএল), প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (এনএলপি) ইত্যাদি আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপযোগী করে ব্যাপক হারে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইনজীবী, আইনি সহায়তা প্রদান সংস্থাগুলোর পাশাপাশি এখন বিচারকরাও নিয়মিত শুধু দাপ্তরিক বা প্রশাসনিক কাজেই কেবল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তা নয়; অধিকন্তু বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায়ও এআই এখন হামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে!

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলম্বিয়ার একজন বিচারক একটি অটিস্টিক শিশুর বীমা কোম্পানি তার চিকিৎসার খরচ বহন করবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় জেনারেটিভ এআই টুল চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেছেন। অন্য একটি ক্ষেত্রে একজন ভারতীয় বিচারক চ্যাটজিপিটিকে জামিনের আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের একজন বিচারক একটি এআই টুল ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে একজন কিশোর অভিযুক্ত জামিনের অধিকারী হতে পারে কিনা। একইভাবে যুক্তরাজ্যের কোর্ট অব আপিলের একজন বিচারক রায়ের একটি অংশ লিখতে এআই ব্যবহার করেছিলেন বলে জানিয়েছেন।

এসব ঘটনা আইনাঙ্গনে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারক কর্তৃক এআই ব্যবহারের কিছু ভাইরাল দৃষ্টান্ত; যেখানে উল্লিখিত বিচারকরা বিচারের জন্য তাদের গবেষণা বা খসড়া রায় লেখার ক্ষেত্রে এআইর প্রয়োগ স্বীকার করেছেন। যদিও বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে এআই ব্যবহারের মাত্রা এর থেকে অনেক বেশি হবে বলে গবেষকদের ধারণা। এমনকি বাংলাদেশের বিচারকরাও হয়তো তাদের নৈমিত্তিক বিচারিক কাজে সহায়তা গ্রহণের জন্য এআই ব্যবহার করে থাকেন। তবে বাংলাদেশে বিচারিক কাজে এআই ব্যবহার করা যাবে কিনা, গেলেও কী পরিমাণে, কখন, কোন ধরনের এআই ব্যবহার করা যাবে এ সংক্রান্ত কোনো আইন, নীতিমালা বা গাইডলাইন নেই। এমনকি বিচারকদের এ বিষয়ে, যেমন এআই কীভাবে কাজ করে, ব্যবহারের উপকারিতা ও ক্ষতিকর দিক প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা নেই এবং এআই-সংক্রান্ত সতর্কতা সম্পর্কিত কোনো প্রশিক্ষণও তাদের দেয়া হয় না। তবে চীন, এস্তোনিয়ার মতো কিছু দেশ স্মার্ট ন্যায়বিচারের দিকে ধাবিত হতে তাদের আইনি ব্যবস্থায় এআই দ্বারা কিছু বিচারকাজ সম্পাদন করার উদ্যোগ এরই মধ্যে গ্রহণ করেছে।

বিচারকাজে আইনের উপযুক্ত বিধান খুঁজে বের করতে এবং আদালতের

সামনে উত্থাপিত মামলায় সেটির প্রয়োগ এবং মামলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ও সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি একটি উপকারী হাতিয়ার হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে এবং একই সঙ্গে আদালতের কাজের নির্ভুলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। তাই কেউ কেউ এটিকে মানুষের বিকল্প একটি সস্তা, দ্রুত এবং মাপযোগ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ মানববিচারকরা প্রকৃতিগতভাবে ব্যয়বহুল হন; কেননা তারা বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুত হতে থাকেন, বিচার করতে সময় নেন, তাদের দক্ষতা অর্জনে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, বেতন-ভাতা ও ছুটি নেন এবং নির্দিষ্ট বয়সের পর অবসরে যান। আবার সংখ্যায়ও তারা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে এআই বিনা বেতনে, তুলনামূলক স্বল্প বিনিয়োগে, ছুটিবিহীন দিন-রাত কাজ করে যেতে পারে।

বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এআইর প্রয়োগ বিশ্বজুড়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩ সালের ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বিচারকদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ তাদের দৈনন্দিন কাজে এআই ব্যবহার করেন। তারা এআই প্রযুক্তি মামলার সংক্ষিপ্তসার ও খসড়া তৈরি, ই-মেইল লেখা, নথি প্রস্তুত এবং আইনি গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

তবে এআই প্রযুক্তি বিচারক, আইনজীবী, আদালত কর্মচারী, বিচারপ্রার্থীদের নানাভাবে সহায়তা ও প্রাত্যহিক কাজ সহজ করে দিলেও বিচারের সব ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি ব্যাপক হারে ব্যবহারে প্রবল ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়েছে।

বিচার করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিচারক যদি এআই ব্যবহার করে থাকেন তবে তা বিচারকদের জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়ায় আপস বয়ে আনতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় এআইর সংমিশ্রণ ঘটানোর মাধ্যমে বিচারিক যুক্তি এবং সিদ্ধান্তের উপসংহারে পৌঁছানোর কারণ রায়ে দুর্বলভাবে উপস্থাপিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কেননা এআই প্রযুক্তি ঠিক কীভাবে কাজ করে এবং কী প্রক্রিয়ায় কোনো একটি বিষয় নিষ্পত্তি করে সে বিষয়ে বিচারকরা সম্যক ধারণা রাখেন না। আবার কোনো একজন বিচারক যে এআই সফটওয়্যার ব্যবহার করছেন এবং যার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে, অধিকংশ ক্ষেত্রেই সেই সফটওয়্যারের কার্যপ্রণালি ও রায় প্রদানের উপযুক্ত কারণ বিস্তৃতভাবে জানেন না। উপরন্তু সফটওয়্যার উৎপাদনকারী কোম্পানি বা প্রস্তুতকারকও সফটওয়্যারের কার্যপ্রণালির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা এ-সংক্রান্ত পরিপূর্ণ তথ্য প্রদান করে না।

তাছাড়া আদালতের যেকোনো আদেশ/রায়/ডিক্রিতে সিদ্ধান্ত প্রদানের ন্যায্যতা এবং যুক্তিসংগত কারণ প্রদান করা হয়ে থাকে; যা ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যেও অন্যতম। এআইর হস্তক্ষেপে ন্যায়বিচারের সেই মূলনীতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে একটি অস্বচ্ছ এআই সিস্টেমের ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আপিল করার অধিকার এবং বিচারকের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার আইনি বাধ্যবাধকতার মতো প্রথাগত জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া কার্যকরিতা হারাতে পারে।

আবার একটি এআই সিস্টেম কীভাবে কাজ করে তা প্রায়ই অপারেশনাল গোপনীয়তার কারণে বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বা এআই টুলের প্রশিক্ষণ ডাটায় ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রকাশ করা হয় না। স্বচ্ছতা, যুক্তি, বিস্তারিত কার্যপ্রণালি, সুস্থিত আইনি ব্যাখ্যা এবং বোঝাপড়ার অভাব এআই প্রযুক্তি যে নিরপেক্ষভাবে বিচার নিষ্পন্ন করছে তা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়; যা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ও ন্যায়বিচারের উন্মুক্ততার নীতিরও পরিপন্থী।

অন্যদিকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বুঝতে পারে এমন কোড, কমান্ড ও ফাংশন আইনি ভাষায় সঠিকভাবে অনুবাদ বা রূপান্তর করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আইনি ভাষায় প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আবার সময় সময় আইনে অনেক সংশোধনী আনা হয়, নতুন নতুন মামলার রায়ের মাধ্যমে উচ্চ আদালত থেকে নজির তৈরি করা হয়, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্র সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে হয়। নানা কারণে আইনকে কম্পিউটারের কোড উপযোগী ভাষায় অনুবাদ করা বেশ জটিল এবং এ কাজে আইনি প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়, যা সাধারণত প্রোগ্রামারদের থাকে না। আবার আইন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোডও নিয়মিত আপডেট করা না হলে সে বিচার ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে।

অতএব বিচারিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অ্যালগরিদমিক ডিসিশন মেকিং (এডিএম) অন্তর্ভুক্ত করলে মৌলিক বিচারিক মূল্যবোধ ও নীতি, যেমন ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, সমানাধিকার, সব নাগরিকের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া এডিএম দ্বারা জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, বয়স প্রভৃতির ভিত্তিতে বৈষম্যেরও প্রবল ঝুঁকি রয়েছে। পক্ষপাত ও বৈষম্যমূলক অ্যালগরিদম, বিচারকদের দ্বারা প্রযুক্তির নির্বিচার ব্যবহার, সংবেদনশীলতা পরিহার প্রভৃতি ঝুঁকির উদ্ভব করে।

এআই প্রযুক্তির অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মানব বিচারকের মতো বিচক্ষণতা, ক্ষেত্রমতে করুণা বা ন্যায়পরায়ণতা (ইকুইটি) প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। কারণ প্রযুক্তি এককভাবে কখনই যথাযথ বিবেচনার সঙ্গে প্রতিটি ঘটনা মূল্যায়ন করার যোগ্য নয়। কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় আনার জন্য আদালতের প্রগতিশীল প্রচেষ্টা নিতে হয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুগ্রহ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে; যা প্রতিটি মামলার স্বতন্ত্র ঘটনা বিশ্লেষণ করে মানবিকতা, বিবেকবোধ ও সুবিবেচনা প্রয়োগ করে কোনো প্রযুক্তি নিতে পারবে না।

এআইর মাধ্যমে বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদানের আইনি কর্তৃত্ব সম্পর্কে জুরিসপ্রুডেন্সিয়াল প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আইনানুসারে কার? প্রোগ্রামার, নীতিনির্ধারক, বিচারক (মানব সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী) বা কম্পিউটার নাকি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নিজেরই? বর্তমান আইনি কাঠামোয় এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়। আবার বিচার প্রক্রিয়ায় এধাই কোনো ভুল করে থাকলে এধাইর সে ভুলের দায় কে নেবে তা নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা।

এছাড়া এআই অ্যালগরিদমে ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা হলে আদালত কীভাবে মামলাকারীদের তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে সেটি নিয়েও বিস্তর সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে এআই দিয়ে বিচারের রায় দিলে সাধারণ জনগণ সে রায়ে কতটুকু আস্থা রাখবে তাও চিন্তার বিষয়। উপরন্তু এআইতে সব সময় নিরাপত্তাঝুঁকি বিদ্যমান যে অ্যালগরিদম যেকোনো সময় হ্যাক বা ম্যানিপুলেট হতে পারে; যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত/রায় এবং বিচার প্রক্রিয়াকে অবিচারের দিকে ধাবিত করতে পারে। সুতরাং এ প্রক্রিয়া অনুসরণে বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে জনসাধারণের আস্থা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

তবে সারা পৃথিবীতে এআই প্রযুক্তির বর্তমান জয়জয়কার ও বহুল ব্যবহার থেকে এটা স্পষ্ট যে এআই ক্রমান্বয়ে আরো উন্নত হবে এবং দ্রুত বিভিন্ন কাজে মানুষের স্থান দখল করে নেবে। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আইনাঙ্গনেও ক্রমান্বয়ে এআই ব্যবহারের ক্ষেত্র বিকশিত হবে। তাই বিচারকাজের মতো গুরুদায়িত্বে এআইর যথাযথ, সুপরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত, জবাবদিহিতামূলক, সংবেদনশীল ও দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শিগগিরই বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান ন্যায়বিচার নিশ্চিত ও বিচারপ্রার্থীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া বিচারকদেরও বিচার প্রক্রিয়ার কোনো অংশে এআই ব্যবহৃত হয়ে থাকলে আবশ্যিকভাবে মামলার কোন পর্যায়ে বা কখন, কীভাবে, কেন এবং কী পরিমাণে এআই ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকাশ করতে হবে। এআই বিচারকদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচারবোধ, বিচক্ষণতা, সুবিবেচনা এবং সহানুভূতি প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

প্রযুক্তি ব্যবহারে পরিবেশের কথা ভাবতে হবে

হীরেন পণ্ডিত

ইলেকট্রনিক (ই-বর্জ্য) বর্জ্য বলতে বোঝায় পরিত্যক্ত বা উপযোগিতাহীন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। এ বর্জ্যগুলো মূলত মানুষের বাসাবাড়িতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন: টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল, ওভেন, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, চার্জার, বাল্ব, ব্যাটারি ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও অব্যবস্থাপনার জন্য মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

ই-বর্জ্যের মধ্যে সাধারণত থাকে লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, রৌপ্য, তামা, সিসা, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি। এসব লৌহজাত, অলৌহজাত ও বিষাক্ত পদার্থের বাণিজ্যিক মূল্যের পাশাপাশি রয়েছে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন উপাদান। তিনটি উৎস থেকে বাংলাদেশে ই-বর্জ্য মূলত উৎপন্ন হয়। যেমন এক. প্রাথমিক ব্যবহার ও মেয়াদোত্তীর্ণ-পরবর্তী পণ্য। দুই. প্রবাসী শ্রমিকদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আনা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং তিন. উন্নত দেশগুলো থেকে অবৈধভাবে আনা পুরনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।

ই-বর্জ্যে সিসা, পারদ, ব্রোমিনেটেড ফ্লেম রিটাডেন্টের মতো বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির কারণে এটি পরিবেশের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে প্রতিনিয়ত। এর অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, যত্রতত্র পোড়ানো ও ভূমি ভরাটের মাধ্যমে মাটি, পানি ও বায়ুকে দূষিত করে। পরবর্তী সময়ে এ দূষণ বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে মানবস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বেই ক্রমাগত এর পরিমাণ ও ধরন বাড়ছে।

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদা পূরণে বাজারে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য। এছাড়া মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় বাজারে রয়েছে বিভিন্ন নিম্নমানের ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং সচেতনতার অভাবে এসব পণ্য ও কোম্পানির চাহিদা বেড়েই চলেছে। ফলে অল্প কিছুদিন ব্যবহারের পরই অনুপযোগী ইলেকট্রনিক ডিভাইস রূপান্তরিত হচ্ছে ই-বর্জ্যে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

বৈশ্বিক ই-ওয়েস্ট মনিটর ২০২৪-এর হিসাবে, ২০২৩ সালে সমগ্র বিশ্বে ৬২ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে, যা পরিবহন করতে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ ট্রাকের প্রয়োজন পড়ে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, ১ টন পরিমাণ মেমোরি কার্ড ও মাদারবোর্ড থেকে প্রায় ৬০০ গ্রাম স্বর্ণ, সাড়ে সাত কেজি রুপা, ১৩৬ কেজি তামা ও ২৪ কেজি টিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা। আবাসিক ও বিভিন্ন অফিসে ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডডিস্কের অন্যতম একটি উপাদান হলো অ্যালুমিনিয়াম ও স্টেইনলেস স্টিল, কম্পিউটার হার্ডডিস্ক হতে পারে এ দুটি উপাদানের ভালো একটি উৎস। অন্যদিকে জিংকের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হতে পারে ড্রাইলেস পরিত্যক্ত ব্যাটারি। এ উৎস থেকে ১৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ জিংক পাওয়া যায়। মোবাইল ফোনের ব্যাটারি ও ল্যাপটপের লিথিয়াম আয়রন ব্যবহার হয় বলে এ উৎস থেকে লিথিয়াম সল্ট প্রস্তুত করা সম্ভব।

২০৩০ সালের মধ্যে ই-বর্জ্য খাতে বছরে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব বলে ধারণা করা হয়। ২০১০ সালের আগের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয় জাহাজভাঙা শিল্প থেকে। যেসব পুরনো জাহাজ ভাঙার জন্য আনা হয় সেখানে মূলত সেসব দেশের ই-পণ্য বা ইলেকট্রনিক বর্জ্য বিদ্যমান থাকে। জাহাজ ভাঙার সময় এবং তৎপরবর্তী এসব বিষাক্ত ই-বর্জ্য মাটিতে ও পানিতে মিশে চক্রাকারে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। এইচএসবিসি বৈশ্বিক রিপোর্ট অনুযায়ী,

২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে, যার বৃহৎ একটি অংশ হবে ইলেকট্রিক পণ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ফোনের গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি, সে হিসাবে প্রতিবছর কয়েক কোটি মোবাইল ডিভাইস যুক্ত হচ্ছে ই-বর্জ্যের ভাগাড়ে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত ২০১৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ই-বর্জ্যের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩ লাখ ১০ হাজার টন ও ৪ লাখ টন এবং প্রতি বছর ই-বর্জ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ২০ শতাংশ, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে পৌঁছাতে পারে ৪৬ লাখ টনে।

অন্য এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে প্রায় ১০ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য তৈরি হয় এবং এসব ই-বর্জ্যের ৮০ শতাংশ আসছে অন্য দেশ থেকে। ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়, এর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ রিসাইকেল করা হয়, অবশিষ্ট ই-বর্জ্য ভাগাড়ে নিক্ষেপ করা বা পুড়িয়ে ফেলা হয়। ইলেকট্রনিক পণ্যে এক হাজারের অধিক ধরনের বিষাক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় ই-বর্জ্যে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সিসা, মারকারি, জিংক, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়ামসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত এক হিসাবে বলা হয়, ২০৩০ সাল নাগাদ দেশে প্রতি বছর বিলিয়ন ইউনিট স্মার্ট পণ্য উৎপাদিত হবে। এসব পণ্যের ই-বর্জ্যের প্রভাবে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ফলে মানুষের শরীরে নানা প্রকার জটিল ও প্রাণঘাতী রোগ ছড়াবে, বিশেষ করে ই-বর্জ্যের কারণে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মহার বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে প্রায় ৬০ হাজারের অধিক শিশু এবং এখানের বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে ৮৩ শতাংশের বেশি শিশু প্রতি বছর অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ইলেকট্রনিক বর্জ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় রিসাইক্লিং করা না হলে এর সঙ্গে যুক্ত মানুষের গর্ভাবস্থা, কিশোরকাল ও শৈশবকাল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে এবং ফুসফুসের গঠনগত বিকাশ ও কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়। ই-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শিল্পে নিয়োজিতদের উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি ও ফুসফুসের ক্ষতি, বিষণ্ণতা, শ্রবণশক্তি হ্রাস, পঙ্গুত্বসহ বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে এখনই সচেতন হওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও বন্দরনগরী খ্যাত চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকায় ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনায় এখনো কোনো ধরনের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পুনঃপ্রক্রিয়াজাত, পুনর্ব্যবহার এবং পরিত্যাজন বা ধ্বংসকরণের সমন্বিত প্রক্রিয়া, যা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যকে ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের হিসাবে চট্টগ্রাম নগরীতে দৈনিক প্রায় ২১০০ থেকে ২৫০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। সাধারণ গৃহস্থালি বর্জ্যের সঙ্গে হাসপাতাল, শিল্প-কারখানা ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলছে গতানুগতিক ও সনাতন পদ্ধতিতে। চট্টগ্রাম শহরের ইলেকট্রনিক বর্জ্য মূলত সিডিএ মার্কেট, কদমতলী, ভাটিয়ারী, আইস ফ্যাক্টরি রোড ও অন্যান্য মার্কেট এবং নগরীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান আইন ও নিরাপত্তাসামগ্রী ব্যতীত রিসাইক্লিং করা হচ্ছে। যা নগর পরিবেশের স্বাভাবিক পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে কিন্তু পর্যাপ্ত রিসাইকেলের ব্যবস্থাপনা না থাকায় যত্রতত্র ই-বর্জ্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ই-বর্জ্যের সঠিক নিষ্পত্তি ও পুনর্ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ধারা ২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা' বিধিমালা ২০২১ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালা অনুযায়ী, ই-বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রের দায়িত্ব হলো পরিবেশসম্মতভাবে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করা; প্রস্তুতকারক, মেরামতকারী, চূর্ণকারীর কাছে পাঠানোর আগে সংগৃহীত ই-বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে

নিরাপদে সংরক্ষণ করা এবং ই-বর্জ্যের নিরাপদ পরিবহন নিশ্চিত করা। কিন্তু এ বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদের প্রতিনিয়ত পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে, মানুষের জীবনে ই-বর্জ্যের প্রভাব, ই-বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনাসহ সচেতনতা বাড়াতে হবে। ই-বর্জ্য কমানোর জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন, অর্থাৎ সহজে যাতে ইলেকট্রনিক পণ্য বর্জ্যে পরিণত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারীদের টেকসই ও পরিবেশসম্মত পণ্য উৎপাদনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে ই-বর্জ্যের ক্রমবর্ধমান সমস্যা চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার এবং বাস্তব আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। ই-বর্জ্যের সমস্যা নিরসনে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে এ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সর্বোপরি দেশব্যাপী ব্যাপক আকারে টেকসই ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

শিল্প বিপ্লব-উত্তর উন্নয়নের নিচে বিষ বিস্ফোরণ

শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপক অগ্রগতির জন্য সর্বাধিক পরিচিত সময়টি কেবল মানব ইতিহাসের গতিপথই পরিবর্তন করেনি, বরং আমাদের গ্রহের ইতিহাসকেও বদলে দিয়েছে। এ সময়কালে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপক অগ্রগতির জন্য সর্বাধিক পরিচিত সময়টি কেবল মানব ইতিহাসের গতিপথই পরিবর্তন করেনি, বরং আমাদের গ্রহের ইতিহাসকেও বদলে দিয়েছে। এ সময়কালে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনেকের জীবনযাত্রার মানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফল হিসেবে মানুষের কায়িক পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়েছে এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ এতটাই হয়েছে যে একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের অনেক কাজই করে দিচ্ছে যন্ত্র।

ব্রিটেনে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল ১৮ শতকের শেষ থেকে ১৯ শতকের গোড়ার দিকে। প্রথম শিল্প বিপ্লবের শুরু বাষ্প ইঞ্জিনের মাধ্যমে এবং সে ইঞ্জিন পরিচালনার জন্য পোড়ানো হতো কয়লা। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে ভারী শিল্পের উদ্ভব ঘটে, যা ইউরোপ ও আমেরিকা হয়ে ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এ সময় ইউরোপের দেশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স দ্রুত শিল্পোন্নত হতে থাকে এবং এ কারণে তাদের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারও দ্রুত বেড়ে যায়। শিল্পায়নের এ পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষণ, বন উজাড় ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বেড়ে যায়।

শিল্প-কারখানার উৎপাদনে উৎকর্ষের কারণে কৃষিকাজ অনেকটা স্তিমিত হতে থাকে এবং অকৃষি পেশা বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে কৃষি অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হয়। কলকারখানার বিকাশের সঙ্গে যেমন অর্থনীতির চাকা দ্রুত গতি পায় তেমনি শিল্প-কারখানা থেকে যেসব দূষক কোনো রকম পরিশোধন ছাড়াই প্রাকৃতিক জলাশয়ে নির্গত হচ্ছে তাতে ভয়াবহভাবে দূষিত হতে থাকে নদীনালা, খাল-বিলসহ সব জলাশয়। এছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য গ্রামের লোক শহরমুখী হতে থাকায় নগরগুলোয় দূষণ বাড়তেই থাকে। আবার দ্রুত ঘনবসতিতে পরিণত হওয়ার কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। শিল্প বিপ্লবের শুরুতে এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন নগরী জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে থাকে।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য শিল্প বিপ্লবের কারণে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের বিকাশের ফলে ভ্যাকসিন আবিষ্কার, উন্নত অস্ত্রোপচারের কৌশল উদ্ভাবন এবং উন্নত জনস্বাস্থ্য প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়। গুটিবসন্তের টিকা ও জীবাণুনাশক পদ্ধতির মতো উদ্ভাবন উচ্চ মৃত্যুহার কমাতে অবদান রেখেছে। নগরায়ণ শেষ পর্যন্ত উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়, যা জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মোটাদাগে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষের কাজের ধরন পরিবর্তন হতে থাকে। আগেই উল্লেখ করেছি যে শিল্প বিপ্লবের পর মানুষ কৃষি থেকে অকৃষিতে ঝুঁকতে থাকে। মজার বিষয় হলো, এর মাঝে সামাজিক পরিবর্তনও শুরু হয়ে যায়। কারখানা মালিকরা অধিক উৎপাদন ও মুনাফার জন্য শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি ও শোষণের জাল বিস্তার করতে থাকেন। শিল্পোন্নত শহরগুলো সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে তার জৌলুশ হারাতে শুরু করে এবং এর দায় চাপানো হয় সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। অন্যদিকে কারখানার গুমোট পরিবেশ, বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শ, যন্ত্রপাতির চাপে বিপজ্জনক পরিবেশ চেপে বসে শ্রমিকদের ঘাড়ে। শুরু হয় শ্রমের দাসত্ব, শিশুশ্রম, এমনকি সপ্তাহে ৬-৮ ডলারের বিনিময়ে ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হয় কর্মীদের। যারা স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা কাজ হারায়, বেকার হয়ে পড়ে। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের পর মানবিকতার চেয়ে অধিক মুনাফা লাভ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নই মুখ্য হয়ে ওঠে।

শিল্প বিপ্লব-উত্তর সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে। বিপ্লবের বিস্তার ঘটেছে নানা শাখা-প্রশাখায়। এ সময়ে বাষ্প ইঞ্জিনসহ নানা যান্ত্রিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে, যা পরবর্তী সময়ে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং শিল্পের নানা শাখায় বিপ্লব ঘটায়। এরই পথ ধরে দশকের পর দশক প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের জন্য বিরাট মাইলফলক। শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগের পরিমাণও বাড়তে থাকে। ফলে নাগরিক সুবিধা লাভের আশায় মানুষ নগরে বসবাসে আগ্রহী হতে থাকে। এ কারণে নগরায়ণ তীব্রতর হয়, বিশেষ করে শিল্প-কারখানাকেন্দ্রিক নগর গড়ে উঠতে থাকে। যেমন ইউরোপের গ্লাসগো, ম্যানচেস্টার কিংবা বার্মিংহামের মতো নগরগুলোর বিকাশ শিল্পায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আশঙ্কার কথা হলো, শিল্পের প্রসারের সঙ্গে এসব অঞ্চলে দূষণও ছড়িয়ে পড়ে। কয়লাচালিত শিল্প-কারখানাগুলো থেকে নির্গত ধোঁয়া এ শহরগুলোর আকাশকে ঘন ধোঁয়াশায় কালো অন্ধকার করে তোলে। এক সময় লন্ডনের বুক চিরে প্রবাহিত টেমসের মতো নদী বর্জ্যের আঁস্তাকুড়ে পরিণত হতে থাকে।

শিল্প বিপ্লবের কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও পরিবেশ করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। প্রথমে উদ্ভাবিত ইঞ্জিনের জন্য জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে তেলের ব্যবহার শুরু হলে দুই উৎস থেকে প্রচুর কার্বন নিঃসরণ শুরু হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের কারণে দূষক নির্গমন বেড়ে যাবে এমন চিন্তা হয়তো শুরুতে কারো মাথায় আসেনি এবং সে কারণে তখন এ নিয়ে কোনো নিয়ম-কানুনও তৈরি করা হয়নি।

মানুষ তখন শুধু উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেই বড় করে দেখেছে এবং সে ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়েছে। ফলে পরিবেশ-প্রতিবেশ নিয়ে যেমন নিরপেক্ষভাবে ভাবার সময় হয়নি তেমনি উন্নয়নের সঙ্গে দূষণ রোধে গুরুত্বও আরোপ করা হয়নি। যতই সময় যাচ্ছে ততই শিল্প বিপ্লব-উত্তর কলকারখানার দূষণের প্রভাব পরিষ্কার হচ্ছে। আমাদের কলকারখানাসহ নানা কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চালনার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার সেই শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে চলে আসছে, শুধু জ্বালানির ধরনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে সারা বিশ্ব, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের চিমনি বানিয়েছে, তাতে দিন দিন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়েই চলছে এবং ফলাফল হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন।

১৭৫০ সালে শিল্পায়ন শুরুর আগে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ছিল ২৭৫ পিপিএম যা বেড়ে হয়েছে ৪১৫ পিপিএম। ১৯৬০ সালে প্রতি বছর কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির হার ছিল ১ পিপিএম যা বছরপ্রতি ৩ পিপিএমে উন্নীত হয়। মানুষ তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩০ বিলিয়ন টনেরও বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছাড়ছে। ১৮ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ৪০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে বলে মনে করা হয় এবং এর ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়ার চরম অবস্থার জন্য দায়ী। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। তথ্যমতে, ১৮ শতকে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের ঘনত্ব ছিল ৭২২ পিপিবি এবং ২০২৩ সালে তা বেড়ে হয় ১৯৩১ পিপিবি, অন্যদিকে নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ২০ শতাংশ বেড়ে প্রাক-শিল্প বিপবকালের ২৭০ পিপিবি থেকে বেড়ে ৩৩৬ পিপিবি হয়েছে। শিল্প বিপ্লব-উত্তর সময়ে প্রায় ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। নির্গত এ কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রায় অর্ধেক মহাসাগর এবং অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র দ্বারা শোষিত হলেও অবশিষ্টাংশ বায়ুমণ্ডলে রয়ে গেছে, ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮ শতক থেকে এ পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব ৪০ শতাংশেরও অধিক বেড়েছে, যার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ জনিত তাপমাত্রা বেড়ে চরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিবেশের ওপর শিল্প বিপ্লব কী প্রভাব ফেলছে তা বুঝতে আমাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে। শিল্পায়ন ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের নেশায় মানুষ এতটাই বিভোর হয়ে পড়ে যে পরিবেশ-প্রতিবেশে শিল্পায়নের প্রভাব নিয়ে চিন্তা করার ফুরসত হয়নি। যেমন গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন এবং নানা উৎস থেকে সিএফসি নির্গমন হয়ে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে যে বিরাট ক্ষয় সাধন কওে ফেলেছে সেটি আমরা ১৯৮০ দশকের আগে টের পাইনি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জনসাধারণের কাছে যেমন অনেকাংশে শুরুতে বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি তেমনি রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেতেও কয়েক দশক লেগেছে। আশির দশকের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যেসব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে এবং সেখান থেকে যেসব মডেল তৈরি করা হয়েছে, বলা চলে সেগুলোর প্রতিটিই প্রমাণ করেছে যে মানবসৃষ্ট কারণে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বেড়েছে এবং এ কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে চলছে। যদিও ১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) গঠনের আগ পর্যন্ত মানুষ স্বীকার করত না যে মানুষের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক আছে।

বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে শিল্প-কারখানাসহ নানা মাধ্যমে যন্ত্র চালনা ও শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার। এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে জলবায়ু সংকটের মূলে রয়েছে উন্নত দেশগুলোর দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক সীমাহীন কার্বন নির্গমন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশগুলো শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বৈশ্বিক নির্গমনের পেছনে বিরাট ভূমিকা রাখছে এবং বিশ্বব্যাপী ৭৯ শতাংশ কার্বন নির্গমনের জন্য দায়ী উন্নত দেশগুলো। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় মাথাপিছু কার্বন নির্গমন ১৮ দশমিক ৯৯ টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪ দশমিক ৯৫ ও কানাডায় ১৪ দশমিক ২৫ টন, যা বিশ্বব্যাপী গড় নির্গমন (৪ দশমিক ৬৬ টন) থেকে অনেক বেশি। মোটের ওপর উচ্চ আয়ের দেশগুলোর গড় জনপ্রতি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় ৩০ গুণ বেশি। সার্বিক হিসেবে উচ্চ এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলো সিংহভাগ কার্বন নির্গমনের জন্য দায়ী। যদিও বিশ্বের অর্ধেকটা নিম্ন-মধ্যম এবং নিম্ন-আয়ের দেশ নিয়ে গঠিত, কিন্তু বৈশ্বিক কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ২০ শতাংশেরও কম নির্গমন হয় এ দেশগুলো থেকে। এক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোর অবদান ১ শতাংশেরও কম। কার্বন নির্গমনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবদান নগণ্য হলেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলো, তবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব প্রশমনে চাপ সৃষ্টি করা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর। উন্নয়নশীল দেশগুলো যখন তাদের অর্থনীতি গতিশীল করার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেখানে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনকারী জীবাশ্ম জ্বালানি পরিহারের চাপ তারা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে কার্বন নির্গমনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা রক্ষা করা হয়ে উঠছে না।

উন্নত রাষ্ট্রগুলো সীমাহীনভাবে তাদের শিল্প-কারখানা থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন করেছে এবং তার বিনিময়ে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। একই পথ ধরে উন্নয়নশীল কিংবা দরিদ্র রাষ্ট্রে সবাই চায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে। যেসব দেশ উন্নয়নের জন্য বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করেছে এবং করে চলছে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরামর্শ দিচ্ছে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রশমনের এবং এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে এবং এর প্রতিফলন দেখা যায় কপ-সহ নানা পরিবেশ সম্মেলনে। আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ২৯ সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দূষণকারী উন্নত দেশগুলোর কাছে যে আর্থিক সহায়তার জন্য দাবি তুলেছিল তা নিয়ে নাটক অসহায় দেশগুলোকে হতাশ করেছে।

কার্বন নির্গমন নিয়ন্ত্রণে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের তাগাদা থাকলেও উন্নয়নশীল কিংবা দরিদ্র দেশগুলোর এ ব্যয়বহুল প্রযুক্তি এবং অবকাঠামোতে যে বিনিয়োগ প্রয়োজন তা বহন করার ক্ষমতা নেই। ফলে এসব দেশকে তার উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে এমন বৈষম্য কমাতে হলে উন্নত দেশগুলোকে শুধু নির্গমন কমালেই চলবে না, বরং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি (শক্তি) ব্যবহারে সক্ষম করার জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে। কার্যত উন্নত ও উন্নয়নশীল কিংবা দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বৈষম্য রেখে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন প্রশমন কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ কতটুকু ফলপ্রসূ হবে সেটা প্রশ্নবিদ্ধ। শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে নির্দ্বিধায় যে বায়ুদূষণ হচ্ছে তা এখন বিষের বেলুন হয়ে বিশ্বকে হুমকি দিচ্ছে এবং এ নির্গমন এখনই নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এর বিস্ফোরণ থেকে ধনী কিংবা গরিব কোনো দেশও রেহাই পাবে না।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

চ্যাটজিপিটির সীমাবদ্ধতা ও মানুষের সৃজনশীলতা

হীরেন পণ্ডিত

আজকের যুগে প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। তবে, একে ঘিরে কিছু উদ্বেগও তৈরি হয়েছে, বিশেষত সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে। চ্যাটজিপিটি, একটি অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল, বর্তমানে সৃজনশীল কাজের প্রতি মানুষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা সৃষ্টি করছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন যে, চ্যাটজিপিটি সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তবে, এই অভিযোগ কি সত্যি, নাকি প্রযুক্তির বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আরও সৃজনশীল হতে শিখছে? প্রথমত, চ্যাটজিপিটি বা যেকোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানব মস্তিষ্কের পরিপূরক, কখনোই তার প্রতিস্থাপক নয়। এই প্রযুক্তি যেমন মানুষের জন্য সময় এবং পরিশ্রম বাঁচানোর সুযোগ সৃষ্টি করে, তেমনই এটি সৃজনশীলতার জন্য নতুন দিগন্তও উন্মোচন করে। একজন লেখক বা শিল্পী যখন কোনো নতুন সৃষ্টি নিয়ে কাজ করেন, তখন চ্যাটজিপিটি তাকে দ্রুত ধারণা বা তথ্য প্রদান করতে সক্ষম। এটি তাদের চিন্তার গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং আরও গভীর, জটিল সৃজনশীল কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে, চ্যাটজিপিটি বা কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল যে সৃজনশীলতা ধ্বংস করছে, এমন ধারণা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক। সৃজনশীলতা মানুষের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য এটি বুদ্ধি, অনুভূতি, এবং অভিজ্ঞতার মিশ্রণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো এককভাবে এটি সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। চ্যাটজিপিটি যদি লেখা, চিত্র বা গান তৈরি করতে পারে, তা শুধুমাত্র মানুষের নির্দেশনা ও পরামর্শের মাধ্যমে। প্রযুক্তির এই সহায়তা সৃজনশীলতাকে মজবুত করতে পারে, না যে তার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বিনষ্ট করবে। সৃজনশীলতার মূল ধারণা হচ্ছে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, এবং এটি কেবল প্রযুক্তির দ্বারা নয়, বরং মানুষের কল্পনা, অনুভূতি, এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ দ্বারা সম্ভব হয়। চ্যাটজিপিটি বা অন্যান্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল কোনো দিনও এই মানবিক উপাদানগুলোর প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। বরং, এটি মানুষের সৃজনশীলতাকে আরও প্রসারিত করতে সহায়ক হতে পারে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রযুক্তির অতি ব্যবহার, বিশেষ করে একে অনুকরণমূলক কাজের জন্য ব্যবহৃত হলে, মানুষের নিজস্ব সৃজনশীলতা হ্রাস পেতে পারে। কাজেই, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা চ্যাটজিপিটি এবং অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার কৌশলগতভাবে করি, যেন এটি আমাদের সৃজনশীল শক্তিকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে, ধ্বংস না করে। শেষে, চ্যাটজিপিটি সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করছে এমন একটি ধারণা শুধুমাত্র একপেশে চিন্তা হতে পারে। সৃজনশীলতা মানবতার অমূল্য সম্পদ, এবং প্রযুক্তি কখনোই তা পরিবর্তন করতে পারে না। বরং, এটি আমাদের নতুন দিগন্তে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে, যদি আমরা সঠিকভাবে এর ব্যবহার শিখি।

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রযুক্তি নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুততর করছে। তবে প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি মাঝে মাঝে আমাদের মেধা ও সৃজনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তি, বিশেষ করে চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে বিভিন্ন কঠিন কাজ সহজে করার জন্য এআই টুল আবিষ্কার হয়েছে। প্রতিনিয়ত এআই টুল তৈরী হচ্ছে। এটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে শুরু করে প্রবন্ধ লেখা, কোডিং, এবং সৃজনশীল কাজেও পারদর্শী। ফলে, মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই নিজে চিন্তা-ভাবনা না করেই এআই-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এভাবেই মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আমাদের সমাজে। মেধা ও সৃজনশীলতা ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে এই চ্যাটজিপিটি।

আমাদের মস্তিষ্কের মাধ্যমে সৃজনশীলতার চর্চা হয়। সৃজনশীল কাজ, সৃজনশীল লেখা সৃষ্টি হয়। যেকোনো কাজে তখন সৃজনশীলতার ছাপ থাকতো। বলা যায় সৃজনশীলতার চর্চা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সেই চর্চা আর হয় না। সেটি এআই টুল ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে। মানব সমাজের মস্তিষ্ক হয়ে পড়ছে নিষ্ক্রিয়। একজন লেখক, শিল্পী বা গবেষক যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে তাদের কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সমাজ, দেশ। এ ধরনের প্রবণতা সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকে অবনতি করছে এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু তা-ই নয়, এনসব লেখা দিয়ে দেশ-সমাজের কতটা উপকার হবে সেটা নিয়েও সন্দেহ থাকে।

এই এআই এমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে এখন, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। এখনকার শিক্ষার্থীরা প্রায়ই তাদের হোমওয়ার্ক, প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র সম্পন্ন করতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করছে। ফলে তাদের গবেষণা করার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণ করার দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সহজেই এআই নির্ভর করে কাজ শেষ করতে পারায়, তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশ থমকে যাচ্ছে। সহজ সমাধানের কারণে মানুষ নতুন কিছু তৈরি করার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। মানুষের ভেতর সেই স্পৃহা একসময় মরে যাবে। এতে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে। যে জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা লোপ পাবে, সে জাতি তত দ্রুত হারিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে কোনো কাজ করে সেই কাজটি নিজের নামে চালানোর প্রবণতাও এক ধরনের চুরি কিংবা অপরাধ। অথচ এভাবে অনেকেই অন্যের কাজ বা ধারণা নিজের বলে প্রচারণা চালায়। যে কাজটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে, নিজের বুদ্ধিতে, নিজের ভাষায় করা হয় সেটিই মূলত সৃজনশীলতা। সেটিই নিজের কাজ হিসেবে সমাজের সামনে উপস্থাপন করা উচিত। যে লেখায় বাক্য গঠন থেকে শুরু করে লেখার আগাগোড়া নিজের সৃষ্টি, সেটিই সৃজনশীল বলে দাবি করা উচিত। চ্যাটজিপিটি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সেটা আপেক্ষিক বিষয়। সময় সেই উত্তর দিয়ে যাবে। চ্যাটজিপিটি থাকা না থাকা নিয়েও বেশ তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। তবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই টুলের এক্সেস সীমাবদ্ধতা করা প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা তৈরি করা দরকার। পাশাপাশি, ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি, যাতে আমরা নিজের মেধা ও দক্ষতাকে বিকাশের সুযোগ পাই। ভবিষ্যতে এআই-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আমাদের জন্য চরম বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষ করে লেখক, শিল্পীর জন্য এটি একটি ভয়ংকর ফাঁদ।

গুগলের নতুন উদ্যোগ: এআই-ভিত্তিক স্টার্টআপকে সহায়তার জন্য

১২ মে, সোমবার গুগল ঘোষণা দিয়েছে তাদের নতুন উদ্যোগ ‘AI Futures Fund’-এর, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত স্টার্টআপগুলোকে সমর্থন প্রদান করবে। গুগল ডিপমাইন্ড, যা কোম্পানিটির গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, তাদের সর্বশেষ অও টুল ব্যবহার করে উদ্ভাবনকারী স্টার্টআপগুলো এই ফান্ড থেকে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ধরণের সহায়তা পাবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সিড স্টেজ থেকে শুরু করে লেট-স্টেজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টার্টআপকে বিনিয়োগ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সহায়তার মধ্যে রয়েছে:

গুগল ডিপমাইন্ডের অও মডেলের প্রাথমিক অ্যাক্সেস

গুগল ও ডিপমাইন্ডের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ

গুগল ক্লাউড ক্রেডিট

কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি গুগলের বিনিয়োগ পাওয়ার সুযোগ

গুগলের এক মুখপাত্র জানান, “AI Futures Fund কোনো নির্দিষ্ট ব্যাচ বা কোহর্ট মডেল অনুসরণ করে না। এটি চলমান ভিত্তিতে সুযোগ মূল্যায়ন করে। নির্দিষ্ট কোনো আবেদন সময়সীমা নেই। কোম্পানির লক্ষ্য ও থিসিসের সঙ্গে মিল থাকলে আমরা বিনিয়োগ বিবেচনা করি।”

এই ফান্ড ইতোমধ্যে কিছু সফল স্টার্টআপকে সহায়তা করেছে। যেমন: মিম তৈরির প্ল্যাটফর্ম ঠরমমষব এবং ওয়েবটুন অ্যাপ এঔড়ড়হংঃৎধ ইতোমধ্যে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

স্টার্টআপরা ১২ মে ২০২৫ থেকে এখানে আবেদন করতে পারবে। লিংক: https://labs.google/aifuturesfund

উল্লেখযোগ্যভাবে, গুগল বিগত কয়েক মাসে এআই খাতে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে, এড়ড়মষব.ড়ৎম গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য ৮২০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল

এআই-তে সৌদির ৯৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

সৌদি আরবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির বিকাশ ও পরিচালনার জন্য হিউমেইন্‌ নামের একটি নতুন কোম্পানি চালু করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। এছাড়া, আজ মঙ্গলবার (১৩মে) রিয়াদে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সৌদি-যুক্তরাষ্ট্র যৌথ বিনিয়োগ ফোরাম-যেখানে আলোচনার সম্ভাব্য মূল কেন্দ্রে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

সম্মেলনে অংশ নেবেন টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক, ওপেনএআই প্রধান স্যাম অল্টম্যান এবং মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ। এছাড়া একই সপ্তাহে উপসাগরীয় সফরের অংশ হিসেবে সৌদি আরব সফর করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও।

বিশ্বের বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক দেশ সৌদি আরব তারভিশন ২০৩০ কর্মসূছির আওতায় তেল নির্ভরতা থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করতে একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করে নিজেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একটি বৈশ্বিক এআই কেন্দ্র

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সৌদি আরব।

এজন্যই সৌদি আরবের সরকারি বিনিয়োগ তহবিল পিআইএফওহিউমেইন্‌-এ প্রায় ৯৪০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। গুগল ও সেলসফোর্সের মতো কোম্পানিও সম্প্রতি পিআইএফ এর সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করেছে।

হিউমেইন্‌ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক বিভিন্ন পরিষেবা ও পণ্য সরবরাহ করবে-যার মধ্যে রয়েছে ডেটা সেন্টার নির্মাণ, ক্লাউড সক্ষমতা, উন্নত মডেল এবং প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তোলা।

বেস্ট ফিনটেক ইনোভেশন' অ্যাওয়ার্ড পেল বিকাশ ও হুয়াওয়ে

বিকাশ ও হুয়াওয়ে ডিজিটাল লোন সেবা চালুর স্বীকৃতি হিসেবে জিএসএমএ গ্লোমো 'বেস্ট ফিনটেক ইনোভেশন' অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। বার্সেলোনায় আয়োজিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস (এমডব্লিউসি) ২০২৫-এ প্রতিষ্ঠান দুইটিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গ্লোমো 'বেস্ট ফিনটেক ইনোভেশন' অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আর্থিক প্রযুক্তি খাতের সেই সব যুগান্তকারী স্বীকৃতি দেয়া হয় যেগুলি জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সেবার পরিচালনা ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে রূপান্তরিত করে। বিকাশ ও হুয়াওয়ে বাংলাদেশে 'পে লেটার' সেবা প্রদানে অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে। এই উদ্যোগ ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে স্বল্পমেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খরচের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করেছে।

২০১৮ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে বিকাশ বাংলাদেশের ৬১% প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়েছে। তবে এখনও ৩৭% নাগরিক জরুরী প্রয়োজনের জন্য উচ্চ সুদের ঋণদাতাদের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া মাত্র ৯% প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে থাকে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিকাশ হুয়াওয়ে-এর সহযোগিতায় 'পে লেটার' সেবা চালু করে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাৎক্ষণিকভাবে ও কাগজের ব্যবহার ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ ও ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয়। এই সেবা বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের নারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদেরকে সাহায্য করেছে। এটি তাদের মূলধন সংগ্রহ ও দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি স্থানীয় ই-কমার্সকে প্রসারিত করেছে।

বিকাশ-এর চিফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার (সিপিটিও) মোহাম্মদ আজমল হুদা বলেন, "হুয়াওয়ের মোবাইল মানি প্ল্যাটফর্মের সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা ২০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পেমেন্ট সেবা দ্রুত প্রসারিত করার পাশাপাশি 'পে লেটার' মাইক্রো ফিন্যান্সিয়াল সেবা চালু করেছি। এই উদ্যোগ লক্ষ-লক্ষ মানুষের আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছে ও বাংলাদেশে সর্বজনীন আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।"

হুয়াওয়ে-এর সফটওয়্যার বিজনেস ইউনিটের প্রেসিডেন্ট মরিস মা বলেন, "বিকাশ-এর সাথে যৌথভাবে গ্লোমো বেস্ট ফিনটেক ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। সেবা ও পণ্য উদ্ভাবনে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে আমাদের গ্রাহক আরও বেশি ব্যবসায়িক সাফল্য খুঁজে পায় ও সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারে।"

গত এক দশকে হুয়াওয়ে-এর মোবাইল মানি সল্যুশন ৪০টিরও বেশি দেশে ৪৮ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীকে আর্থিক সুবিধা দিয়েছে। এতে রয়েছে বিশেষ ক্লাউড-নেটিভ ডিস্ট্রিবিউটেড আর্কিটেকচার, যা প্ল্যাটফর্মের ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতা ও সীমাহীন সম্প্রসারণ সক্ষমতা নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন থাকে। শক্তিশালী ডেটা ও এআই ইঞ্জিনের সাহায্যে হুয়াওয়ে মোবাইল মানি দ্রুত ও কার্যকরভাবে আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণের পাশাপাশি আয়ের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এই প্ল্যাটফর্মের উন্মুক্ত অবকাঠামো যেমন নতুন ব্যবসায়িক উদ্ভাবনকে বিকশিত করে, তেমন এটি ডিজিটাল লাইফস্টাইলকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীদের জন্য আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও উন্নত আর্থিক সেবা নিশ্চিত করে।

স্পেনের বার্সেলোনায় ৩রা মার্চ থেক ৬ই মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস (এমডব্লিউসি) ২০২৫ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হুয়াওয়ে এই ইভেন্টে ফিরা গ্রান ভিয়া হল ১-এ স্ট্যান্ড ওয়ান এইচ ফিফটি-তে প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধুনিক পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করছে। ২০২৫ সালে বাণিজ্যিকভাবে ৫জি-এডভান্সড প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) টেলিকম অপারেটরদের ব্যবসা, অবকাঠামো, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। একটি বুদ্ধিবৃত্তিক/ইনটেলিজেন্ট বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য হুয়াওয়ে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর ও সহযোগীদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইন্টারনেট সেবায় সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবি জানাল বাক্কো

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও রপ্তানি আয়ের ধারাবাহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কন্ট্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্কো) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতি ইন্টারনেট সেবায় আরোপিত ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জারি করা অধ্যাদেশে ইন্টারনেট সেবার ওপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তুলে ধরে বাক্কো জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের গতিশীল উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বাক্কো সভাপতি তানভীর ইব্রাহীম বলেন, "ইন্টারনেট সেবা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অন্যতম প্রধান অবকাঠামো। এই শুল্ক আরোপের ফলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আইটি শিল্প প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হবে। পাশাপাশি, দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমে যাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে, যা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে"।

বাক্কো সাধারণ সম্পাদক ফয়সল আলিম বলেন, "বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। এই শিল্পের রপ্তানি আয় অদূর ভবিষ্যতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব। তবে এই অগ্রগতি ধরে রাখতে নীতিগত সহযোগিতা এবং কর সংক্রান্ত সহজীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"।

বাক্কো মনে করে, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অবকাঠামো হিসাবে ইন্টারনেট সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পের টিকে থাকা এবং সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন এবং রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে ইন্টারনেট সেবায় আরোপিত সম্পূরক শুল্ক অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হোক।

গুগলের ওয়ার্কস্পেস ও ক্লাউড সলিউশন দেবে রেডিংটন

দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসাগুলোর জন্য গুগল ওয়ার্কস্পেস এবং ক্লাউড সলিউশন নিয়ে এসেছে রেডিংটন। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপের ব্যবসাগুলো এখন গুগল ক্লাউডের মাধ্যমে আরও কার্যকর এবং প্রযুক্তিনির্ভর হবে।

প্রযুক্তি সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রেডিংটন লিমিটেড সম্প্রতি গুগল ক্লাউডের সাথে অংশীদারিত্বে যুক্ত হয়েছে। এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসাগুলোতে ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা। তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য গুগল ওয়ার্কস্পেস এবং গুগল ক্লাউডের মতো আধুনিক প্রযুক্তিগুলো সহজলভ্য করে ব্যবসায়িক দক্ষতা ও উদ্ভাবনে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করা।

এ বিষয়ে রেডিংটন লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রমেশ নাটারাজন বলেন, আমরা ডিজিটাল রূপান্তরকে গতিশীল করে উদীয়মান ও উন্নত মার্কেটের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গুগল ক্লাউডের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব এই প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করেছে। আমরা ব্যবসাগুলোকে ক্লাউড প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষম করতে চাই এবং একইসাথে সাথে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনী টুলস সরবরাহ করতে চাই । যাতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো ডিজিটাল যুগে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

শাওমি নিয়ে এলো ১০ কোটি টাকার ঈদ ক্যাম্পেইন

আসন্ন ঈদ উল আযহাকে ঘিরে ১০ কোটি টাকা সমমূল্যের উপহারসহ ঈদ উইথ শাওমি ক্যাম্পেইন নিয়ে এলো গ্লোবাল টেক জায়ান্ট এবং বাংলাদেশের এক নম্বর স্মার্টফোন ব্র্যান্ড শাওমি। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় শাওমি স্মার্টফোন কিনে নির্বাচিত যোগ্য ফ্যানরা পুরস্কার হিসেবে পেতে পারেন ৫ লক্ষ টাকা, মাল্টি ডোর রেফ্রিজারেটর অথবা এসিসহ চমৎকার সব উপহার। আকর্ষণীয় এ অফারটি আজ ৭ মে, ২০২৫ থেকে আরম্ভ হচ্ছে।

বিশেষ এ ক্যাম্পেইনটির আওতায় শাওমি রেডমি নোট ১৪ কিনে গ্রাহক উপহার হিসেবে পেতে পারেন রেডমি ইয়ারবাডস অথবা নিশ্চিত ৫০০ টাকা ক্যাশব্যাক। শাওমি রেডমি নোট ১৪ প্রো (৮ জিবি+২৫৬ জিবি) ভ্যারিয়েন্টের ফোন কিনে গ্রাহক পেতে পারেন রেডমি ইয়ারবাডস অথবা টিশার্ট। এছাড়াও শাওমি রেডমি ১৩ (৬জিবি+১২৮জিবি) ভ্যারিয়েন্টের স্মার্টফোন কিনলে গ্রাহকরা পাবেন ন্যূনতম ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। সেই সাথে শাওমি রেডমি ১৩ (৮জিবি+১২৮জিবি) এবং শাওমি রেডমি ১৪সি মডেলের যেকোনো ভ্যারিয়েন্টের স্মার্টফোন ঈদের এই ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে পাওয়া যাবে ১০০০ টাকা মূল্যছাড়ে। উল্লিখিত মডেলগুলো ছাড়া যেকোনো শাওমি স্মার্টফোন কিনলেও গ্রাহক পেয়ে যাবেন রেডমি ইয়ারবাডস, টিশার্ট, মোবাইল ডেটা অফারসহ নিশ্চিত পুরস্কার।

'ঈদ উইথ শাওমি' ক্যাম্পেইনটি শাওমি ফ্যানদের অবিরাম ভালোবাসা ও সমর্থনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়াস উল্লেখ করে শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার জিয়াউদ্দিন চৌধুরী বলেন, "আসন্ন ঈদ উৎসবকে আরও রাঙিয়ে তুলতে গ্রাহকদের জন্য আমরা ১০ কোটি টাকা সমমূল্যের এই ঈদ ক্যাম্পেইন চালু করেছি। 'ঈদ উইথ শাওমি' ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শাওমি ফ্যানদের ঈদ আরও আনন্দময় ও স্মরণীয় হয়ে উঠবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।"

'ঈদ উইথ শাওমি' ক্যাম্পেইনে নিশ্চিত সব উপহার পেতে শাওমি ফোন কেনার সময় রিটেইল কোডটি জেনে নিতে হবে। এরপর EWMIMEI NoRetail Code লিখে ২৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে গ্রাহকের জিতে নেওয়া অফার সম্পর্কে জানা যাবে।

আরও তথ্যের জন্য, গ্রাহকরা শাওমি হেল্পলাইনে +৮৮০৯৬১২-৯৪২৬৬৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

শাওমি সম্পর্কেঃ

শাওমি কর্পোরেশন ("Xiaomi") ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০১৮ (১৮১০.এইচকে) এ হংকং স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান বোর্ডে তালিকাভুক্ত হয়। শাওমি হল একটি কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এবং স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। শাওমি ১৭ জুলাই ২০১৮ সালে বাংলাদেশে নিজেদের অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে শাওমি বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ওয়ালটন কম্পিউটার পণ্যে ৫০% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট

ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, অল-ইন-ওয়ান পিসি, ট্যাবলেট, প্রিন্টার, মনিটর, স্পিকারসহ বিভিন্ন কম্পিউটার এক্সেসরিজ কেনায় পণ্যভেদে নিশ্চিত সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশের শীর্ষ প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিডেট। নতুন বছরে ক্রেতাদের জন্য কম্পিউটার পণ্য কেনায় উপহার হিসেবে '২৫-এ ৫০% মেগা সেল অফার' ক্যাম্পেইনের আওতায় এই সুবিধা দিচ্ছে ওয়ালটন। ক্রেতারা যেন সামান্য কম দামে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর মানহীন রিফারবিশড পণ্য ক্রয় না করেন বরং সাশ্রয়ী দামে উচ্চমানের সঠিক পণ্যটি কিনতে পারেন সেজন্যেই আইটি পণ্যে এই বিশাল সুবিধা দিচ্ছে ওয়ালটন ডিজি-টেক।

সারাদেশে ওয়ালটন প্লাজা, ডিস্ট্রিবিউটর শোরুম অথবা ওয়ালটনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পণ্য কেনায় ৫০% পর্যন্ত ডিসকাউন্টের এই সুবিধা পাচ্ছেন গ্রাহক। পাশাপাশি ১ হাজার টাকা বা এর বেশি মূল্যের পণ্য কেনায় ফ্রি হোম ডেলিভারি সুবিধাও রয়েছে। ঘরে বসেই অনলাইনে যঃঃঢ়ং://ধিষঃড়হফরমরঃবপয.পড়স/ফরংপড়ঁহঃ-ড়ভভবৎ এই ওয়েবসাইট থেকে ওয়ালটনের কম্পিউটার পণ্য সহজেই অর্ডার করতে পারছেন। ১১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে ক্যাম্পেইন। চলবে চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

শনিবার (১১ জানুয়ারি, ২০২৫) রাজধানীতে ওয়ালটনের করপোরেট অফিসে আয়োজিত '২৫-এ ৫০% মেগা সেল অফার' শীর্ষক ডিক্লারেশন প্রোগ্রাম-এ ক্রেতাদের জন্য এসব সুবিধার ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিডেট এর চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ রায়হান, ডিজি-টেকের অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এএমডি) লিয়াকত আলী, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি.'র ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাজ্জাদ হোসেন এবং চিফ বিজনেস অফিসার (কম্পিউটার ও পিসিবিএ) তৌহিদুর রহমান রাদ।

ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান এস এম রেজাউল আলম বলেন, দেশের সাধারণ ক্রেতাসহ সবাই যেনো সাশ্রয়ী দামে সঠিক ও পছন্দের আইটি পণ্যটি কিনতে পারেন; সেই জন্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। ওয়ালটন সবসময়ই ক্রেতাদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কম্পিউটার পণ্য কেনার ক্ষেত্রে এই বিশেষ ছাড় দিচ্ছে ওয়ালটন ডিজি-টেক। এর মাধ্যমে ক্রেতাগণ বাংলদেশে তৈরি সর্বাধুনিকমানের পণ্য কেনা ও ব্যবহারে আরও উদ্বুদ্ধ হবেন। ওয়ালটন প্রতিনিয়ত তার পণ্যের মান উন্নয়নে কাজ করছে। শতভাগ কোয়ালিটি নিশ্চিত করে আমরা বাজারে পণ্য দিচ্ছি। আমাদের প্রোডাক্ট লাইনে নিত্য নতুন পণ্য ও অত্যাধুনিক ফিচার যুক্ত করছেন ওয়ালটনের রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন উইংয়ের প্রকৌশলীগণ।

ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. রায়হান বলেন, নিজস্ব প্রোডাকশন লাইনে উৎপাদিত ওয়ালটনের আইটি পণ্য ওয়ালটন ব্র্যান্ডকে আরো শক্তিশালী করেছে। প্রযুক্তি যেমন দ্রুত এগিয়ে চলছে, ওয়ালটনও তেমন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে। ওয়ালটন হাই-টেক ইলেকট্রনিক্স সেক্টরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে আর ওয়ালটন ডিজি-টেক নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রযুক্তি পণ্য খাতে। আমাদের প্রত্যাশা, প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে দেশে নাম্বার ওয়ান হবে ওয়ালটন।

ওয়ালটন ডিজি-টেকের এএমডি লিয়াকত আলী বলেন, বর্তমানে আইটি বাজার রিফারবিশড পণ্যে সয়লাব হয়ে গেছে। সামান্য কম দামের জন্য রিফারবিশড পণ্য কিনে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এসব পণ্য পরিবেশের জন্যেও ক্ষতিকর। ক্রেতারা এসব যেনো মানহীন রিফারবিশড পণ্যে আকৃষ্ট না হন; তারা যেনো সাশ্রয়ী দামে উচ্চমানের সঠিক পণ্যটি কিনতে পারেন সে জন্যেই আইটি পণ্যে এতো বিশাল সুবিধা দিচ্ছে ওয়ালটন।

জানা গেছে, ক্যাম্পেইনের আওতায় অন্যান্য কম্পিউটার এক্সেসরিজ পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মডেলের অ্যাকসেস কন্ট্রোল, ক্যাবল অ্যান্ড কনভার্টার, কার্টিজ, সিসিটিভি, কুলার, হাব, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, রাউটার, স্মার্ট ওয়াচ, ট্যাবলেট, ওয়েইট স্কেল, পাওয়ার ব্যাংক, মেমোরি কার্ড, র‍্যাম, এসএসডি ড্রাইভ, মাউস, পেন ড্রাইভ, হেডফোন, ওয়াই-ফাই রাউটার, ইউএসবি ক্যাবল, স্পিকার, পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, ইউপিএস ইত্যাদি।

ক্যাপশন: ওয়ালটন কম্পিউটারের '২৫-এ ৫০% মেগা সেল অফার' ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ।

অনলাইনে পণ্য বিক্রি করে সফল টাঙ্গাইলের নারী উদ্যোক্তা

জেলায় অনলাইন ভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা দিন দিন বাড়ছে। গত তিন-চার বছর ধরে পোশাক, আচার, কেকসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, অর্গানিক অয়েল, কসমেটিক্স, জুয়েলারী, কাসা ও পিতলের জিনিসপত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, পাটের তৈরি জিনিসপত্রসহ নানান পণ্যের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উইমেন এন্ড ইকমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) ফেসবুক ভিত্তিক পেইজে যুক্ত হয়ে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন জেলার অনেক নারী উদ্যোক্তা।

এতে ঘরে বসেই পরিবারের কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন তারা। অল্প পুঁজিতেই নারীরা অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে সফল হয়েছেন।

কেউ কেউ ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা আয় করছেন। জেলার প্রায় দুই শতাধিক নারী উদ্যোক্তা এভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন। দিন দিন বাড়ছে এদের সংখ্যা।

স্থানীয়ভাবে মূলতঃ অনলাইনে মানুষের খাদ্যপণ্য ও পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে করোনাকালীন সময়ে অনেক নারীই ঘরে বসে উদ্যোক্তা জীবন শুরু করেন। যা এখনো ধরে রেখেছেন নারী উদ্যোক্তারা।

জেলার সখীপুর উপজেলার নারী উদ্যোক্তা সানজিদা আহমেদ জুই একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে জেলা ও জেলার বাইরে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন।

তিনি বলেন, আমার ছোট বেলা থেকে ইচ্ছে ছিল পড়াশোনার পাশাপাশি কিছু একটা করবো। কোথাও চাকরি করলে অন্যের অধীনে কাজ করতে হয়।

আমার লক্ষ্য ছিল অন্যের অধীনে কাজ না করে নিজে নিজে কিছু একটা করার। ২০২০ সালের দিকে করোনাকালে 'উই' নামের একটি ফেসবুক গ্রুপ খুঁজে পাই।

আমার স্বামী ও বাবা-মার কাছে পরামর্শ নিয়ে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে কাঁথাসহ ছোট বাচ্চাদের পোশাক নিয়ে কাজ শুরু করলাম।

একটি ফেসবুক পেইজ খুললাম। প্রথম দিনেই অর্ডার আসে অন্য জেলা

থেকে। প্রথম বিক্রি ছিল মাত্র ৫০০ টাকা। এতে কাজের প্রতি উৎসাহ পাই। শুরু হলো কাজ করা।

আমার ৯৫ ভাগ পন্য বিক্রি হয় অনলাইনে, আর ৫ ভাগ বিক্রি হয় অফলাইনে। এখন প্রতি মাসে আমার ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হয়।

লাভ থাকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। বর্তমানে আমার প্রতিষ্টানে প্রায় ৫০জন নারী কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি নকশি কাথা, সরিষার বালিশ, শিমুল তুলার বালিশ, ফ্যামেলি কম্বো ড্রেস, পাটের ব্যাগ, হাতের কাজের জুয়েলারিসহ বিভিন্ন রকমের পণ্য নিয়ে কাজ করি।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় ও বিসিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণও নিয়েছি। পৌর শহরের পশ্চিম আকুর-টাকুর পাড়া এলাকার নারী উদ্যোক্তা নাহিদা ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালের দিকে পোশাক নিয়ে কাজ করে ভালোই চলছিল।

তারপর আমার বাচ্চা হলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, দুই বছর আগে করোনার সময় অনেকের দেখাদেখি আমিও অনলাইনে যুক্ত হয়ে জোড়ালোভাবে ব্যবসা শুরু করলাম।

এখন অনলাইনে বিভিন্ন খাদ্যপণের ব্যবসা করেছি। বর্তমানে সংসারে কাজের ফাঁকে আমি সব ধরনের বাংলা খাবার, চিকেন ফ্রাই, বিফ কারি, ভেজিটেবলস, সালাদ, বিভিন্ন ধরনের বিরিয়ানী, পোলাউ, শর্মাসহ অর্ডার মোতাবেক বিভিন্ন মজাদার খাবার তৈরি করি। বি

য়ে অনুষ্ঠানসহ বিভিন্নে অনুষ্ঠানের খাবারেরও অর্ডার নিয়ে থাকি। কাজ করতে পারলে প্রতিমাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে পরিবারের সহায়তা প্রয়োজন।

অর্গানিক প্রোডাক্ট বিডি'র স্বত্বাধিকারী ও কলেজ ছাত্রী ঋতু বর্ণা বলেন, আমি গত তিন বছর ধরে লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইনে অর্গানিক হেয়ার অয়েল, অর্গানিক হেয়ার প্যাক, অর্গানিক ক্রিম, অর্গানিক বডি লোশন ও ঝাল মুড়ির মসলার ব্যবসা করছি।

ভালোই সাড়া পাচ্ছি। আমাদের 'উইমেন এন্ড ই-কমার্স ট্রাস্ট ফোরাম (উই) নামে একটি গ্রুপ রয়েছে, ফেইজবুকে যার সদস্য ১ মিলিয়নের উপরে।

এটা আমাদের অনলাইনে ব্যবসার একটি বড় প্লাটফর্ম। এর মাধ্যমে অনেক বিক্রেতারাই পণ্য বিক্রি করছেন সহজে। আমাদের নিজস্ব ফেসবুক পেইজেও পণ্যের ছবি দিয়ে থাকি, ওখান থেকেও ভালো সাড়া পাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই অনলাইনের প্রতি ঝুঁকছেন, এতে এই খাত আরো বড় হচ্ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি অনলাইন থেকে বাড়তি আয় হচ্ছে।

বর্তমানে আমার মতো অনেক ছাত্রী অনলাইন ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। আমাদের যদি সরকারিভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আরও এগিয়ে যেতে পারবো।

চাকরি পিছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো। উই'র টাঙ্গাইল জেলা প্রতিনিধি ও 'স্বপ্নের সন্ধানে' নামের একটি পেইজের স্বত্বাধিকারী মাহবুবা খান জ্যোতি বলেন, বাসায় স্বামীকে খাওয়ানোর জন্য আচার করে সেই ছবি ফেসবুকে দিয়েছিলাম।

আর সেখান থেকেই অর্ডার পাই বেশ কয়েক ধরনের আচারের। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মাত্র ২৬০ টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এখন প্রতি মাসে প্রায় লাখ টাকা আয় করছেন জ্যেতি।

সংসার সামলেও ব্যবসায়ীর খাতায় নাম লিখিয়েছেন এই নারী উদ্যোক্তা। বর্তমানে তিনি টাঙ্গাইল পৌর শহরের পূর্ব আদালত পাড়া এলাকার একজন পরিচিত মুখ।

জ্যোতির কাছে মিলবে পছন্দ অনুযায়ী ঘরে তৈরি স্বাস্থ্যকর কেক, বিভিন্ন রকমের আচার, আমসত্ত্ব, হাতের তৈরি ডিজাইনের শাড়ি, পাঞ্জাবি ও বাচ্চাদের ফতুয়া। খাবারসহ বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

জ্যোতি বলেন, ২০২০ সালের প্রথম দিকে জয়েন করেছেন 'উই' নামক ফেসবুক গ্রুপে। গ্রুপটিতে যুক্ত হওয়ার পর জানতে পারেন ক্ষুদ্র ব্যবসার ইতিবৃত্ত।

প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে শুরু করেন আচার, আমসত্ত্ব। ইতোমধ্যে তার আমসত্ত্ব সাড়া ফেলেছে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায়। দেশের বাইরেও এর কদর বেড়েছে। আমসত্ত্ব ও আচারের গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট তার ভোক্তারা। তাই অর্জন করেছেন টাঙ্গাইলের 'আমসত্ত্ব জ্যোতি' খেতাব।

ক্রেতাদের কাছ থেকেই পেয়েছেন এ নাম। তবে টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলা ও বিদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকেন তিনি। এটাকে আরও প্রসারিত করার চিন্তা তার।

তিনি বলেন, আমাদের টাঙ্গাইলে প্রায় ২২০ জন নারী উদ্যোক্তা কাজ করছেন। বিসিক থেকে আমাদের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে থাকে বিসিকি। টাঙ্গাইল জেলা বিসিক কার্যালয়ের শিল্প নগরী কর্মকর্তা জামিল হুসাইন বলেন, দিন দিন টাঙ্গাইলে নারী উদ্যোক্তা বাড়ছে।

নারীরা অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাদেরকে বিসিক থেকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে আউটলুকে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছে মাইক্রোসফট

মাইক্রোসফট ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখতে আউটলুকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিগগিরই আউটলুকের বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধের পাশাপাশি আউটলুকের 'লাইট' সংস্করণ মুছে ফেলা হবে।

আউটলুকের সঙ্গে জিমেইল অ্যাকাউন্টও যুক্ত করতে পারবেন না ব্যবহারকারীরা। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বেসিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তির নিরাপত্তা তুলনামূলক কম।

আর তাই আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আউটলুকে বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আউটলুকে আধুনিক অথেনটিকেশন মেথড ব্যবহার করা হবে।

ফলে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ছাড়াও একাধিক পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের পরিচয় যাচাই করা হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বর্তমানের তুলনায় আরও বাড়বে।

আউটলুকের লাইট সংস্করণের ওয়েব অ্যাপ মুছে ফেলা হবে আগস্টের ১৯ তারিখে। লাইট সংস্করণটি মুছে ফেলার পর ব্যবহারকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে আউটলুক ওয়েব অ্যাপের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

এটি অ্যাকাউন্টকে আরও সুরক্ষিত রেখে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে। এ ছাড়া আউটলুকে এখন জিমেইল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার সুযোগ থাকলেও ৩০ জুন এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।
এর ফলে আউটলুকের মাধ্যমে আর জিমেইলে প্রবেশ করা যাবে না। আউটলুকের পার্টনার গ্রুপ প্রোডাক্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক ডেভিড লস বলেছেন, নতুন এসব পরিবর্তন আসার পর আউটলুক ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উইন্ডোজ ১০ থেকে পরবর্তী সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

মাইক্রোসফট এজ ও ক্রোম ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৯ সংস্করণ এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৮ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

লজিটেক নিয়ে এসেছে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস

লজিটেক নিয়ে এসেছে কমপিউটারে দ্রুত বাংলা লেখার সুযোগ দিতে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো। গত মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'লজিটেক এমকে২২০' মডেলের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে লজিটেকের দক্ষিণ এশিয়া ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের বিটুবি ও বিটুসি বিভাগের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'বাংলাদেশের বাজারে লজিটেকের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিজয় বায়ান্নর লেআউট দিয়ে তৈরি করা কি-বোর্ডটি পানিরোধক হওয়ায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ২.৪ গিগাহার্টজের একটি ডঙ্গলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিটার দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-বোর্ড ও মাউসটি। ফলে কি-বোর্ড ও মাউসটির মাধ্যমে বাসা বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করা যাবে। তবে এটি গেমারদের জন্য নয়।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসটিতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যালকালাইন ব্যাটারি।

ফলে কি-বোর্ডটির ব্যাটারি ২৪ মাস ও মাউসের ব্যাটারি ১২ মাস পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করা যাবে। তারহীন কি-বোর্ড ও মাউস কম্বোটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪৯ টাকা।